বিয়ে ঝরা ফুল
BOIBAZAR
আবদুল হামীদ ফাইযী

(সামাজিক উপন্যাস)

আব্দুল হামীদ

করকমলে।

সূত্রপাত

প্রেম-ভালবাসা মানব-জীবনের একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। নারী-পুরুষের মাঝে কেবল স্বামী-স্ত্রীর প্রেমই স্বাভাবিক ও সর্বৈবভাবে বৈধ। পক্ষান্তরে বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয় সৃষ্টিকর্তার বিধান ও সামাজিক নৈতিকতার বিধানে অবৈধ। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মাঝে প্রেম যতটা অবৈধ, তার থেকে অনেক বেশি অবৈধ বিবাহিত নারী-পুরুষের মাঝে প্রেম। আর সেই জন্য ইসলামী বিধানে অবিবাহিত ব্যভিচারী নারী-পুরষের শাস্তি হল একশত বেত্রাঘাত, কিন্তু বিবাহিতের আছে মৃত্যুদণ্ড।

প্রেম সৃষ্টির নানা কারণ আছে, নানা মাধ্যম আছে। কিঞ্চিৎ কারণেই প্রেম সৃষ্টি হয়, প্রেমিকের কোন একটা বিষয় ভাল লেগে গেলেই ভালবাসা সৃষ্টি হয়, ভাল ভাষা থেকেও ভালবাসা জন্ম নেয়। অবাধ মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাৎ প্রেম আনয়ন করে। বর্তমান যুগের মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট অবৈধ প্রেমিক-প্রেমিকাদের সুন্দর মাধ্যম।

তাগূতী আইন অবৈধ প্রেমে উৎসাহ দেয়। প্রচারমাধ্যমগুলি তাতে সহযোগিতা করে। মহা সমারোহে পালিত হয় বিশ্বভালোবাসা দিবস।

যে সকল কিশোর-কিশোরীরা প্রেমের উন্মাদ ও মত্ততার সাথে পরিচিত নয়, তারা অপরের দেখে শেখে, প্রেমের উপন্যাস পড়ে শেখে, ফিল্ম্ দেখে শেখে। কেউ শেখে, অবৈধ প্রেম করা ভাল নয়। কেউ শেখে প্রেম করার নানা পদ্ধতি। যার যেমন মতি, তার তেমন গতি।

ভাল মানুষও অবৈধ প্রেমে পড়তে পারে। আল্লাহর ভয় না থাকলে আল্লাহর ঘর থেকেও প্রেমের বাঁশি বাজাতে পারে। যে যুগে মোবাইল-ইন্টারনেট ছিল না, সে যুগের প্রেম কেবল চিঠি-পত্র ও সাক্ষাতের উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে তা সীমিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা অসীম ও দুর্দম। আর তার জন্যই বেড়েছে নানা অশান্তি, সে কথা পত্র-পত্রিকায় প্রায় প্রত্যহই নজরে পড়ে।

প্রেম মহাবীর বিশ্ববিজয়ী। সামাজিক বাধা, সংযম ও বিশ্বাসের বেড়া ডিঙিয়েও জয়লাভ তথা ছয়লাব করে। স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত বিশ্বাস রেখে বিশ্বস্ত ও পরহেযগার বন্ধু বা প্রাইভেট মাস্টারের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ দেয় স্বামী। অতঃপর তিন পক্ষই আমানতের খিয়ানত করে। সাজানো বাগান উজাড় ক'রে দেয় অবৈধ প্রেমের নাগ-নাগিনী।

আমার এ লেখাটিও ১৯৮১ সালের, যখন আমি মহিষাডহরীর ছাত্র। অবৈধ প্রণয়-ঘটিত নানা অশান্তি সৃষ্টি ও সুখের সংসারে আগুন লাগা দেখে লিখেছিলাম। উদ্দেশ্য সতর্ক করা। আশা করি জ্ঞানিগণ সেইভাবেই গ্রহণ করবেন।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ
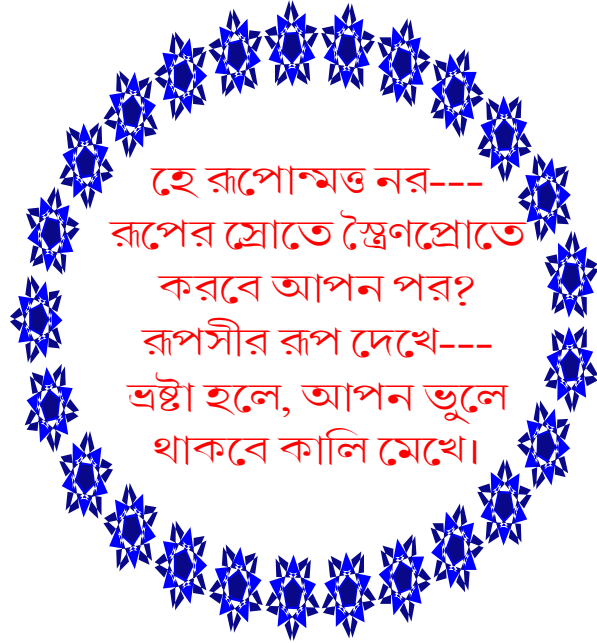
(১)

---মা, মা, মা---! আজকে রান্নাটা তুমিই করো। হাসীনার মাথা ধরেছে।

মাতা পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে চরম বিরক্তিভরে এবং অবাক-ভিজা কণ্ঠে বলল, 'রান্না? তার মাথা ধরেছে? কোথায় সে?'

পুত্র দ্বিতলের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বলল, 'শুয়ে আছে।' তারপর যেখানে যাবার চলে গেল।

কিছু পরে কর্ত্রী ধীরে ধীরে দ্বিতলে উঠে গেল। দেখল, পুত্রবধূ একটি বই হাতে সত্যিই শয়ন ক'রে আছে। সম্মুখে গিয়ে বলল, 'বউমা! রান্নার ব্যবস্থা করগে, বেলা উঠেছে। এখন কি আবার শুতে হয় মা! শরীর-স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

হাসীনা শাশুড়ী-মাতার প্রতি বিরক্তিপূর্ণ চক্ষুতে এক নজর তাকিয়ে, তারপর বইয়ের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে পুনরায় শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে বলল, 'আজ আমি রাঁধতে পারব না। আমি যে অসুস্থ, তা কি আপনার ছেলে বলেনি?'

কর্ত্রী যা বুঝল, তাতে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নীচে নেমে এসে রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগল।

যখন রান্না প্রায় শেষ হতে চলেছে, তখন বউ শাড়ি-সাবান হাতে নিয়ে বাথরুমের দিকে গেল। রান্নাশালে শাশুড়ীর রান্না করা দেখে মনে মনে বলল, 'এর পরেও আর রাঁধছি না আমি।'

শাশুড়ীর মনে সন্দেহ ছিল, সত্যই তার মাথা ধরেছিল কি না।

হঠাৎ এ পরিবর্তন কেন---তার কারণ বুঝে উঠতে পারল না। হয়তো বা বড়লোকের মেয়ে বলে তার বিলাসিতার প্রথম ধাপ এটাই।

দুপুর বেলায় কর্ত্রীর হাতে বাড়া ভাত সকলেই খেল। সকলেই নিজ নিজ কক্ষে বিশ্রাম নিতে গেল। পুত্রবধূও সেই সাথে হাত ধুয়ে উঠে গেল। একটি বারও পিছন ফিরে না তাকিয়ে সোজা দ্বিতলে নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করল।

শাশুড়ী অপমানের আগুনে ভিতরে জ্বলছিল, কিন্তু সে আগুনে ছাই চাপা দিয়ে লম্বা গলায় ডাক দিয়ে বলল, 'বউমা! চলে গেলে? থালা-বাটিগুলো পানি বুলিয়ে দিলে না?'

কিন্তু কই? বউ আর নেমে এল না। অগত্যা শাশুড়ী অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করল বটে, কিন্তু এবারে সে বধূর প্রতি অত্যন্ত চটে গেল। নিতান্তই সে যে কোন নতুন খেয়ালে পড়েছে, সে কথা বুঝল কর্ত্রী। কিন্তু কী সেটা? কুঁড়েমি ছাড়া আর তো কিছু নয়।

কথাটা মতীর নিকটে যেতে বাকী রইল না। মতী মাতার কথায় মনে মনে স্থির করেই নিল যে, সে স্ত্রীকে কিছু বলবে। কিন্তু সে স্ত্রীর সুদর্শন মুখ দর্শন ক'রেই প্রেমাবেগে কোন কথাই তুলল না। ভাবল, এ তো সামান্য সাংসারিক ব্যাপার। এ নিয়ে প্রেমের মধুর হাঁড়িতে বিষ আনা কেন?

এমনিতেই মতী স্ত্রীর রূপ-সাগরে ডুব দিয়ে তার একনিষ্ঠ পূজারী ছিল। সেই সুবাদে স্ত্রী স্বামীর কাছে প্রভুত্ব লাভ করেছিল। স্বামী ছিল স্ত্রীর আঁচল-ধরা রূপ-পাগল পুরুষ। তবে সে কেন স্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ অথবা তার ত্রুটির কোন প্রতিবাদ ক'রে তার মনকে তিক্ত করবে? সুতরাং সে মাতার অভিযোগের কোন গুরুত্ব না দিয়ে মনে মনে সিদ্ধান্ত

নিল যে, সে তাকে মেনে ও মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে বলবে।

কর্তা-কর্ত্রী উভয়েই বড় নম্র প্রকৃতির মানুষ। কোন কথা কাউকে জোর দিয়ে বলতেই পারে না। একমাত্র সন্তান মতীউর রহমান। তার পূর্বে ছেলেমেয়ে দুইই হয়েছিল, কিন্তু কী জানি কী হয়েছিল, তাদের একজনও জ্ঞানচক্ষুতে এ পৃথিবীর রূপ দর্শন করেনি। উভয়েই শৈশবে প্রাণ হারিয়েছে। কেবল এই মতীই 'মরা বেঁচে' পিতামাতার আদরের দুলাল এবং পরবর্তীতে এক ধনীকন্যার গলার মোতির হার হয়েছে।

আহা! বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মনে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা! সাধের একটা ছেলে। তার বিবাহ দিয়ে সাধের বউ আসবে। আর তাদেরকে নিয়ে গড়বে সুখের সংসার। মোতির জ্যোতি পিতামাতার বার্ধক্য-অন্ধকারে আলো দান করবে। যে বয়সে বিশ্রাম নেওয়ার কথা, সে বয়সে পোতা-পুতিন নিয়ে কত আনন্দ করবে। কিন্তু কোথায় সে আশা? বধূর আচরণ-ঝড় সে আশার বাসা যেন নিমেষে উড়িয়ে দিচ্ছে। আজ সংসার যেন দুঃখ ও কলহের মরু-সাহারার দিকে ধাবিত হচ্ছে। পুত্রকে শিক্ষিত করা হয়েছে, তারই বা সুফল কী? এ শিক্ষিত যুবকও যে স্ত্রীর অন্ধ প্রেমে অত্যুৎসাহী হয়ে স্ত্রৈণ হয়ে গেছে!

আর তারা পুত্রকে বলবেই বা কী? শিশুবেলা হতে তাকে কত আদর-যত্ন দিয়ে মানুষ করা হয়েছে। তার গায়ে যেন ফুলের আঁচড় না লাগে, তার শত চেষ্টা করেছে তারা। আজ তারা বৃদ্ধ হয়েছে। তাদের কথায় কর্ণপাত কি যুবক-যুবতীরা করে? তারা জানেই বা কী? আর পুত্র-পুত্রবধূ আধুনিক শিক্ষিত। তাদেরকে কোন নীতিকথা বা উপদেশের কথা বলা মানেই উপহাসের আঘাত আনা। কী দরকার প্রতিবেশীদের কারো কিছু বলা? আত্মীয়-স্বজন কেউ না, কেউ কোন

প্রতিবাদ বা প্রতিকারের জন্য মুখ খোলে না। যেহেতু সকলেই পুত্র অপেক্ষা পুত্রবধূকে অধিক মাত্রায় ভয় করে।

কিন্তু কর্ত্রীর চেষ্টার ত্রুটি নেই, অন্ত নেই। কীভাবে বধূ বুঝবে, কেমন ক'রে সে নিজ সংসার বুঝে-গুছিয়ে নেবে তার ভাবনা ভাবে। অবসর সময়ে পরিবেশে সংসার ভাঙ্গার কত গল্প শোনায়, কলহ এড়াবার জন্য ঘটমান বর্তমান কত বাড়ির উপদেশমূলক উদাহরণ পেশ করে, কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় না। যেন বধূর মতি এক, প্রকৃতি এক। তা ফিরাবার নয়, শুধ্রাবার নয়। একেবারে সীল করা, মোহর আঁটা!

নতুন বধূকে যখন কড়া কথা বলা হয়, তখন সে ছোট্ট শিশুর মতো কান্না শুরু ক'রে দেয়। অথচ সংসারের কোন কাজের জন্য তার মনও হয় না, যা শ্বশুরবাড়ির কর্তব্য। আবার যখন স্বামী বাড়ি ফিরে আসে, তখন সে কথা তার কানে তুলতেও ভুল করে না। স্বামীর নিকটেও ঠিক সেই শিশুকন্যার মতো নাকে কাঁদে। তার একান্ত সুখের সময়েও সংসারের নানা অভিযোগ আনে। আর তাতে স্বামী বেচারা যেন ফাঁপরে পড়ে। সুখের সময় দুঃখের কথা শুনে মন তিক্ত হতে চায়। অধিক তিক্ত হয় পিতামাতার প্রতি। আর স্ত্রীকে আশা ও সান্ত্বনার রূপকথা শুনিয়ে নিজের হক আদায় ক'রে নেয়।

আপন ধর্মে এইভাবেই একটি বৎসর ঘুরে গেল। শাশুড়ী-পুত্রবধূর বিবাদ-কলহ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠল। সকাল হতেই একটা না একটা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। ছোট-বড় কোন একটা বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়। প্রতিবেশীর কেউ শাশুড়ীর পক্ষ, কেউ বধূর পক্ষ নেয়। যে যার নুন খেয়েছে, সে তার পক্ষ নিয়ে কথা

বলে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে। কেউ কষ্ট পায়, কেউ মজা নেয়।

এ সকল খবর বধূর পিত্রালয়ে পৌঁছতে বাকী থাকল না। যেদিন ছিল খুব বাড়াবাড়ির খবর, সেদিনই পিতা গাড়ি এনে নিজ কন্যাকে বাড়ি নিয়ে গেল। আপন মন্তব্য কেউ করতে ছাড়ল না। অবশেষে 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' বৃদ্ধ শাশুড়ীর ঘাড়ে পাহাড় স্বরূপ এসে পড়ল।

শুক্রবার সকালেই মতী পত্র পেল। লিখেছেন শ্বশুর মহাশয়, বলেছেন, 'যে পায়ে থাকো, সে পায়েই তুমি আমার বাড়িতে হাজির হও।' কোন কারণ উল্লেখ করেননি তিনি। তবে মতী তার কিছু অনুমান অবশ্যই ক'রে নিল যে, নিশ্চয় মায়ের সাথে বউয়ের কোন কলহ হবে।

আর অন্য কেউ হলে হয়তো যেতো না। শ্বশুর বলেই শনিবার সকালেই সে গাড়ি ধরল। বাড়ি না এসে সোজা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উপস্থিত হল।

মুখ মিষ্টি করানোর পর বড় শালাজ পাশে এসে বলল, 'বিয়ে করা কেন ভাই! স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য যদি না-ই জানবে। বেশ তো ঝঞ্ঝাটহীন থেকে পড়াশোনা করতে। শুধু শুধু একটা নারীকে জীবনের সাথে বেঁধে তাকে বাড়িতে একাকিনী ফেলে রেখে কষ্ট দেওয়ার কী মানে হয়?

মতীর অনুমান ভুল ছিল না। শালাজের কথায় সে যেন একটি কাপুরুষে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু সে কথা ধরারও নয়। কারণ, উপহাস-পাত্রীর গুঁতাকে জুতা মনে না ক'রে ফুল মনে করতে হয়।

হঠাৎ প্রসাধিকা স্ত্রী সামনে আসতে তার মনে আরও চমক ধরল। বিনা বাক্যব্যয়ে অবাক ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য একে অন্যের প্রতি তাকিয়ে নজর ফিরিয়ে নিল।

পুনরায় শালাজ বলতে শুরু করল, 'তোমার মা বড্ড বউ-কাঁটকী। এত ভাল নয়। দিনরাত হাসীনার সাথে মুরগী-লড়াই লেগেই থাকে। এত কিছু বুঝি না ভাই! আমরাও তো বউ হয়েছি। কই আমাদের শাশুড়ী-বউয়ে তো কোন দিন কলহ বাধেনি। আমার মনে হয়, তোমার মধ্যে কোন গলদ আছে।

উত্তরে মতীর কিছু বলার আগেই হাসীনা বলে উঠল, 'মা-কে ও কিছুই বলে না। মা ওর বেহেশ্‌ত। আমাকে মায়ের পায়ের তলায় ফেলে বেহেশ্‌ত নেবে! আমাকে ও আসলে ভালবাসে না।'

অতঃপর তার কাজল-পরা চক্ষু বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে এল। কি জানি, তা দুঃখাশ্রু, নাকি কুম্ভীরাশ্রু?

তার ছোট ভাবী মতীর উদ্দেশ্যে বলে উঠল, 'ভালবাসলে আবার এই অবস্থা হয়? শিক্ষিত বলে পরিচয় নেই তোমার! কেমন ডোগলা হে তুমি?'

এবারে মতী আমতা সুরে বলল, 'আমি সব সময়ই হাসীনাকে এ্যাড্‌জাস্ট্‌ ক'রে চলতে বলি। মেনে ও মানিয়ে নিতে বলি।'

ছোঁ ক'রে মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হাসীনা বলে উঠল, 'অবুঝকে মানানো যায় নাকি? তোমার মা-বাপ মূর্খ, অশিক্ষিত, তাই তো এ্যাড্‌জাস্ট্‌ করতে পারি না।'

মা-বাপের অপমান হলেই বা কি? সেও তো তার সুন্দরী বধূ। তাও আবার নতুন নতুন ন'কড়ার বউ। তাকে কি আর রাগানো চলে? এক তরফা শুনে যত রাগ উপচে পড়তে লাগল বৃদ্ধ মাতার উপর। নানা আলোচনা-পর্যালোচনার মাঝে রাত্রি গভীর হল। তারপর ঘুম কি আসে? রূপসী স্ত্রীর চাইতে বেশী অভিমান নিদ্রা বেগমের।

সকাল হলে শ্বশুর মহাশয়ের কথা অনুসারে সস্ত্রীক বাড়ি ফিরল মতী। কলহের কারণ জানার আগ্রহ না রেখেই বিষমাখা বাক্-তরবারির আঘাত হানতে লাগল বৃদ্ধ মাতার উপর। আর সেই আঘাতে মাতাপিতার দিল-মন খান-খান হয়ে গেল।

এক সময় পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা সালিস হয়ে ঠিক করা হল যে, কাজ কাজ ক'রেই যখন এত ঝামেলা, তখন বাড়িতে দাসী রাখা হোক। সেই রান্নাবান্নাসহ ঘর-সংসারের কাজ সম্পন্ন করবে।

কিন্তু কর্ত্রী পুরনো মানুষ। অর্থের মায়াতেই চায় না দাসী রাখতে। তবুও মতীর মতেই দাসী রাখার কথাই পাক্কা হয়ে গেল।

কর্ত্রী বলল, 'কিন্তু দাসী রাখার খরচ আমি সংসার হতে দিতে পারব না। যার জন্য দাসী খাটবে, সে পারে তো বাপের বাড়ি থেকে এনে দেবে।'

বধূ তার উত্তর দ্বিতল হতেই দিল, 'বিয়ের আগে আমার বাবা পঞ্চাশ হাজার টাকা গুনে দিয়েছে, তা মনে নেই বুঝি?'

কর্ত্রীও জবাবে বলল, 'সে তো ভাল জামাই পাওয়ার জন্য দিয়েছিল। বাঁদী খাটাবার জন্য দিয়েছিল নাকি?'

পুত্রবধূ বলল, 'আমিও এ বাড়িতে বাঁদী খাটতে আসিনি।'

শাশুড়ী বলল, 'নিজের কাজ নিজে করলে "বাঁদী খাটা" বলে না। তাহলে আমিই বা কেন বাঁদী খাটব, আর তুমিই বা কেন আমীরজাদী হয়ে পা দুলিয়ে খাবে?'

সবশেষে মতী ধমক দিয়ে সকলকে চুপ করিয়ে ঝি রাখার উপরেই জোর দিল।

স্ত্রী খুশী হল। অতঃপর স্বামীর আনুগত্য ও সোহাগের মাটিতে

শিকড় গেড়ে আপন খেয়ালে আরও যথেচ্ছাচারিতা শুরু ক'রে দিল।

দু-একদিনের মধ্যেই বাড়িতে দাসী রাখা হল ঠিকই, কিন্তু তার কাজ হাসীনার মোটেই পছন্দ নয়। ছোটখাটো ভুলেও সে দাসীকে গালিমন্দ করতে ছাড়ে না। বরং কোন কাজ তার মনের বিপরীত হলে অনেক সময় প্রহার পর্যন্ত করতে বাকী রাখে না। কী জানি কোন্ সাহসে? কোন্ সে অসীম সাহসে সে কাউকেও ভয় করে না, মানেও না।

এইভাবে ঘর থেকে বাইরের লোক প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তার আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। সকলের মুখেই যেন নিত্যকার আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে উঠল শিক্ষিত বধূর কথা। যারা মূর্খ আছে, তারা শতগুণে শ্রেয়। এ শিক্ষিতা নিজের শিক্ষার আলোকে আরো পাঁচজনকে আলোকিত করা বাদ দিয়ে যেন অন্ধকারের দিকে পথ দেখাচ্ছে। এ কোন্ নারী? নারী তো পুরুষের তুলনায় অনেক দুর্বল। কিন্তু এ তো অবলা নয়, সফলা সবলা। নারী তো মায়াময়ী, করুণাময়ী। কিন্তু এ যে সাক্ষাৎ পুরুষ! তবে কি পুরুষেরই উৎসাহে? স্বামী কি তাকে শিক্ষা দেয়, সাহস যোগায়?

বৃদ্ধা বলল, 'না মা! আমি ভেবে কূল-কিনারা পাই না কী হবে। এ সোনার সংসারে কী জ্বালা আনলাম! খুঁজে খুঁজে কোন্ বেদ্বীনের পাল্লায় পড়লাম। আমার মান-সম্মান সব হারিয়ে বসলাম।'

প্রতিবেশী রশীদা বলল, 'ডালিমের আব্বা বলছে, ডালিমকে ডাক্তারি পড়াব। কিন্তু দেখে-শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে। বলে, না পড়লে গাধা হয়ে থাকবে। পাঁচটা উচ্চ পর্যায়ের মানুষের সাথে ওঠা-বসা ও সভ্য সমাজে বসবাস করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ পাচ্ছি, পড়াশুনা করেই যেন গরু হয়ে যাচ্ছে! ছিঃ! লোকের সামনে মুখ দেখানো দায়। বউ না হয় পরের মেয়ে, তা বলে ছেলেকেও কি এমনি হতে হয়? এমন ছেলে যার স্ত্রীর কারণে মাথা থাকে না, তার রেলে মাথা দিয়ে মরা ভাল। বউই বা কী কলহ-প্রিয়া বাবা! যার কাছে চিরদিন থাকতে হবে, তার সাথেই বিবাদ? এ যেন নিজের বসার জায়গা কাদা করছে, খাবার পাত ফুটো করছে। পানিতে বাস ক'রে কি কুমীরের সাথে বাদ করা সাজে?

কর্ত্রী শুধু বলল, 'বুঝেও যে বুঝে না, তাকে বুঝানো দায়।'

---সত্যিই বোন! এ যেন 'বিষে ভরা ফুল।' যখন আমরা বউ দেখলাম প্রথম, তখন কী সুন্দর ব্যবহার! জান ঢেলে কথা বলত। আমি মনে করেছিলাম, গাঁয়ের মধ্যে সেরা বউ তোমারই। কিন্তু হল তার বিপরীত। বাহ্যিক বড় মনোরম, কিন্তু ভিতরে চরম গ্লানি!

---কি নির্ভিক, কি দাম্ভিক! দাসী তো কাল থেকে আসেইনি। আসবে কেন? সে কাজ করবে, পয়সা নেবে। পরের কটু কথা, গালিগালাজ কেন শুনবে? মার কেন খাবে? কিন্তু যত চাপ পড়ল আমার উপরে। আমি বুঝতে পারছি, আমার এ ছোট্ট সংসারও এবার ভাঙ্গবে। কে বলে, 'ছোট সংসার সুখী সংসার, বড় সংসার ঝামেলা হাজার।' কই আমার ছোট সংসারে সুখ কোথায়? আর দেখ মাজুর বড় সংসারে কত সুখ, কত মিল-মহব্বত!

---ওসব কপাল বোন! ছোট-বড় কোন কথা নয়।

---ঠিক পৃথক হওয়ার মন। তবে কি ভাঁড়ার ঘর করলাম, বিড়ালের হাতে চাবিকাঠি দেওয়ার জন্য? সে তো অল্প কয় দিনেই নিঃশেষ ক'রে ফেলবে, উজাড় ক'রে দেবে সংসার। কুপয়া মেয়ে সব উড়িয়ে দেবে। উঃ! কী ভুলই না হয়েছে। সবই যে অবাধ্য কুপুত্রের

নামে লেখা আছে। এতেই তো আমার কপালে আগুন ধরেছে।

---ঠিকই বলেছ বোন! সেখানেই তো মজা। শিক্ষিত বউ কি দলীল-পত্র দেখতে জানে না? সে সবকিছু জেনে-বুঝে এমনটি করছে। সে জানে যে, মরদটি হাতে থাকলেই এ ঘর-বাড়ি, জমি-জায়গা, পুকুর-বাগান সবই তাদের। তবে আবার কাকে ভয় করবে, কিসের ভয় করবে? ঐ বউই একদিন তোমাদের বুড়ো-বুড়ির হাতে ভিক্ষার ডালি দেবে দেখবে। কিন্তু কেন এমন করেছ তোমরা? কিছু কি তোমাদের নামে নেই?

---কেনার সময় তারই নামে কেনা হয়েছে। বিঘে দুই জমি আমার নামে করা আছে। আর বাইরের ঐ গোয়াল-ঘরটা। বাকী ভিতর বাড়ি, দালান-বাগান সব ছেলের নামে আছে।

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধার চক্ষু অশ্রু ঝলমল হয়ে উঠল। কান্না সুরে আরো এক প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগল সে। সে প্রসঙ্গ বধূর চরিত্র। বধূ গ্রামের একটি ভ্রষ্ট-নষ্ট মেয়ের সঙ্গে ওঠা-বসা করে। সে খুব ঘনঘন এ বাড়ি যাতায়াত করে। বহু দুশ্চরিত্রের সাথে তার যোগাযোগ আছে। বলতে লাগল, এমন অবুঝ ছেলে। কী তার যুক্তি? যখন বউকে বললাম যে, 'ওই মাগীর সঙ্গ ছেড়ে দাও মা! ও ভাল মেয়ে নয়। ওর চরিত্র ভাল নয়। বেশ্যার মতো ওর কারবার। যদি তোমার সই করার ইচ্ছে থাকে, তাহলে গ্রামে ভাল ভাল ঘরে কত ভাল মেয়ে রয়েছে, তারাও স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করেছে।' তখন বউ আমাকে ঝাঁঝিয়ে জবাব দিল, 'আমিও কি বেশ্যা হয়ে যাব নাকি? একবার বেশ্যার কাজ করলে, চিরদিন কেউ বেশ্যা থাকে?---'

পরপর বেটার কানেও সে কথা তুলেছিল। শিক্ষিত যুক্তিবাদী ছেলে

আমাকে বলল, 'মা! তুমি কী পাগলামি করছ হাসীনার সাথে? একটা পূর্ণ পরিচিত পরিবেশ ত্যাগ ক'রে এসে অন্য এক অপরিচিত নতুন পরিবেশে বাস করতে হলে মনের মতো সাথী-সঙ্গীর প্রয়োজন আছে। যাতে মনটা ফ্রি হয়। তা না হলে মনে কষ্ট হয়। টিকতে অসুবিধে হয়। তোমার কী এমন ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ওর সাথে সই পাতানোতে?'

আমি তার যুক্তিতে সালাম জানিয়ে বললাম, 'আমার কিছু অসুবিধা হবে না বাবা! আমি আর ক'দিন আছি? তোমার কোন অসুবিধা না হলেই ভাল।'

নামায পড়তে বললে বলে, 'নামায পড়ে কে বড়লোক হয়েছে?' আবার সেদিন পর্দার কথা বলতে গেলাম, তাও বোরকা পরার কথা বলিনি, কেবল বললাম, 'তোলা পানিতে গোসল করছ, আর এ পাড়া-ও পাড়া কেন করবে? মাথায় কাপড়টা তো অন্ততঃ নিয়ে চলো।'

জবাবে সে আমাকে বলল, 'মন ঠিক থাকলে পর্দার দরকার নেই। কত বোরকা-ওলীদের দেখ গে ঘোমটার ভিতরে খেমটার নাচ। তারা বাইরে গেলে গায়ে বোরকা দিয়ে যায়, আর ঘর তাদের হাসপাতাল!'

ছেলের কানে পৌঁছলে, ছেলেও আমাকে বলল, 'পর্দা তো নিজের কাছে। ঘরে লুকিয়ে থাকলেই কি পর্দা হয় নাকি?'

এর পর আর কী বলার আছে বোন! যাদু করার মতো ব্যাপার। হঠাৎ ছেলে যে এমন পাগল হয়ে যাবে, তা কল্পনাতেও ভাবতে পারিনি। বেহেশ্তের সুখ যে বাড়িতে নামার কথা ছিল, সে বাড়িতে দোযখের অগ্নিজ্বালা। হে আল্লাহ রহম কর।

(২)

সংসার-উন্নয়নে বধূ যখন একান্তই ঘাড় পাতল না, তখন শাশুড়ী মাতা অগত্যায় আত্মীয়-স্বজন ও বিয়াই-বিয়ানকে একত্র ক'রে পৃথগন্ন করার ব্যবস্থা করল। এই ব্যবস্থাপনায় বধূও যেন উঠে-পড়ে লাগল। কারণ, সে এটাই এতদিন ধরে চেয়ে আসছিল। আর সে কথা প্রায় সকলের জানাও ছিল। তবুও ব্যাপারটা যেন বড় আশ্চর্যময়। কেননা, এ বাড়িতে তাদের কোন শরীক নেই। কর্তা-কর্ত্রী মরার পর তারাই তো একছত্র সম্রাট-সম্রাজ্ঞী। তবুও কী জানি, কেন এত শীঘ্রতা অথবা ঝঞ্ঝাটহীন হতে তাদের এত ত্বরা?

এ অবস্থায় যে কর্তা-কর্ত্রীর বিশেষ ক্ষতি হবে তা নয়। বরং সকল কাজ নিজের হাতে করতে হলেও অন্ততঃ কলহ থেকে বেঁচে যাওয়ার কল্যাণ লাভ হবে। কিন্তু মনে হয়, অল্প দিনের ভিতরে হয়তো সংসার তছনছ হয়ে যাবে। যাই বা হোক ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এই রূপ প্রস্তাব সমর্থিত হল সকলের তরফ হতে। এখন মনে হল এবার সকলেই সুখী হবে। কিন্তু সে সুখ কি কম দুঃখের?

'জীবন-চাকা কলের মতো ঘুরছে জীবনভর,
সকাল-দুপুর আপন সবাই সাঁঝের বেলায় পর।'

মনে কত আশা ছিল, পুত্র-পুত্রবধূ নিয়ে সুখের সংসার করবে। শেষ জীবনটা সুখের সাগরে সাঁতার কাটবে। কিন্তু হায়রে,

'ছিল যারা অনুকূল,
তারা হয়ে প্রতিকূল
যায় চলে অকূলে ফেলিয়া।'

ওদিকে কাজের মেয়ে নিয়ে হাসীনা কাজ সারে। স্বাধীন জীবন-যাপন করতে তাকে বড় আনন্দ লাগে। তার জন্য কেউ কষ্ট পেলে তার কী? সে তো শুধু মতীর। আর মতী শুধু তার।

তখন হাসীনা গর্ভবতী। মতী তাকে বলল, 'আমার আসা তো সম্ভব হয়ে উঠবে না। অতএব হঠাৎ দরকার পড়লে মা-বাপকে যেন ডেকে নিও।

হাসীনা অধোবদনে বলে উঠল, 'প্রয়োজন কী?'

মতী বলল, 'তোমার যখন প্রসবের সময় হবে, তখন তো অপরের সাহায্য ব্যতীত উপায় নেই। যাই হোক না কেন, মা যখন মুরুব্বী বর্তমান রয়েছে, তবে আর অন্যকে কেন?'

হাসীনা একই ভাবমূর্তি নিয়েই বলল, 'হঠাৎ দরকার হলে আমার কাজলী আছে। সেই সব খুব পারবে।'

মতী আর কিছু বলবার চেষ্টা করল না। যাবার সময় মাতাকে বলল, 'মা! হাসীনার কোন অসুবিধা হলে একটু দেখো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা বলল, 'দেখব বৈকি?'

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি গো-গাড়ি এসে বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হল। এসেছে হাসীনার ছোট ভাই হাসীনাকে নিতে। কারণ প্রথম পোয়াতির বাপের বাড়িতেই খালাস হওয়ার রীতি আছে। অতএব বলার কারো কিছু নেই। হাসীনা সঙ্গে সঙ্গে প্রসাধন টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজ করতে লাগল। এখন যেন তার মনে আনন্দের ঝড় এসে গেল।

মতীর সেদিনে আর শহরে ফেরা হল না। অবশ্য সে না থাকলেও হাসীনা এমনিই চলে যেতে পারত। সে আম অনুমতি তার নেওয়া

আছে এবং এমন অভ্যাসও তার আছে।

সখী কাজলীও যথাসময়ে হাজির হল। দিনে না হলে সে পাঁচবার আসেই। এসেই যেন সে হাসীনাকে নিয়ে পীড়াপীড়ি শুরু ক'রে দিল, 'তুমি চলে গেলে আমি কী ক'রে থাকব? তুমি কবে ফিরবে? তোমাকে যেতে হবে না।----'

হাসীনা বলল, 'আমার সাথে চল, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সখী বলল, 'না সখী! তাও কি হয়? অত দিন! তবে মাঝে মাঝে দেখা ক'রে আসব।'

হাসীনা তাতেই তুষ্ট হল।

গাড়ি যখন বিদায় হল, তখন কাজলী হাজীপুকুর পর্যন্ত সখীর সাথে যেতে ছাড়ল না। আজ যেন তার হৃদয়-সঙ্গিনী তাকে ছেড়ে চিরতরে বিদায় নিচ্ছে। দেখে-শুনে কর্ত্রীর গা যেন জ্বলে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল, পুত্রের পথের কোথায় যেন কন্টক রোপিত হচ্ছে। মেয়েটা যে মোটেই ভাল নয়। ইতিপূর্বে তাকে নিয়ে গ্রামে কত কাণ্ড ঘটে গেছে। তার কীর্তিকলাপ নিয়ে কত বিচার-সভা বসেছে। তার আচরণ মনে পড়তেই কর্ত্রীর গা শিউরে উঠছে। আর সেই দিন খুব কাছে বলে মনে হচ্ছে, যেদিন সে হাসীনাকেও নিজের চিরাচরিত অভ্যাসের রঙে রঞ্জিত করবে। তখন হয়তো 'বিষে ভরা ফুল' আরো বিষময় হয়ে উঠবে।

গাড়ি যখন পাকায় উঠল, তখনও কাজলী পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে সে সখীর বিদায়রত চলমান গাড়ির প্রতি তাকিয়ে ছিল। সখীও একবার ক'রে গাড়ির ঘেরাটোপের মুখ থেকে শাড়ির পর্দা তুলে কাজলীর বিরহদগ্ধ দণ্ডায়মান মূর্তি দর্শন করছিল এবং সেই সাথে উভয়ে হাতের ইশারায় বারবার বিদায় ইঙ্গিত

জানাচ্ছিল। অতঃপর গাড়ি যখন দৃষ্টির অন্তরালে গেল, তখন একটা বেদনাহত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে কাজলী বাড়ি ফিরে এল।

পিত্রালয়ে বেশী দিন গত হল না, হাসীনার একটি সুন্দর ফুটফুটে পুত্র-সন্তান জন্ম নিল। পুত্রের রূপ মাতার অনুরূপ। সে যার গর্ভে জন্ম নিয়েছে, তারই ছবি যেন আঁকা তার সর্বাঙ্গে। কী মধুমাখা মুখাকৃতি! সবাই আনন্দে আত্মহারা। সবাই তাকে কোলে তুলে সোহাগ-কণ্ঠে আদর করে, পাড়া-প্রতিবেশী ও স্বজনেরা পুত্র দর্শন করতে আসে, কে কত উপহারও দিয়ে যায়। কেউ ঋণ দিয়ে যায়, কেউ ঋণ পরিশোধ ক'রে যায়। লোকাচারের রীতি এটা। ঋণ ক'রে ঋণ পরিশোধ করার রীতিও বড় চালু সমাজে।

পিতা কন্যার শ্বশুরালয়ে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু হাসীনা ঘোর আপত্তি জানিয়ে বলল, 'না আব্বা! সেখানে সংবাদ দিয়ে কোন লাভ নেই। সে তো শহরে আছে। হয়তো সে আগামী শনিবারে এখানে আসবে।'

অতঃপর ছোট ভাইকে লক্ষ্য ক'রে বলল, 'ভাইটি! তুই একবার সেখানে যা, গিয়ে সেই আমার সই কাজলীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়। আর ওদের ঘরে খবর দিবি না যেন।'

কিন্তু পিতার একটা সামাজিক সৌজন্যবোধ আছে। সে তাতে অসম্মতি প্রকাশ ক'রে বলল, 'না। তোদের যখন যা হয়েছে, হয়ে গেছে, বয়ে গেছে। এখন তাদেরকে এ খুশীর সংবাদ জানানো একান্ত জরুরী। এ সন্তান তো তাদেরই ভাবী বংশধর। এ ব্যাপারে খুশীর অধিকারী তারাই বেশী। বরং সবাইকে খবর দিয়ে আসতে বলিস।'

সর্বসম্মতিক্রমে তা-ই হল।

পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ কর্ণগোচর হলে কর্ত্রী যেন সমস্ত গ্লানি ভুলে আনন্দে নেচে উঠল। পুত্রবধূর সমস্ত অশোভন আচরণ ভুলে গিয়ে মনের এক কোণে যেন স্থান দিল তার সেই বিস্মৃত ভ্রূ-কুঞ্চিত মুখশ্রীকে।

সংসারের দায়িত্ব কর্তার উপর চাপিয়ে দিয়ে সে বিয়াই-বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। কর্তার গেলে তো হবে না। গরু-ছাগল আছে, তাতে আবার চাষের সময়। মাইন্দারই তাকে রেখে আসবে। তারপর কোন এক ফাঁকে গিয়ে সেও স্নেহের পৌত্রকে দেখা ক'রে আসবে।

এক সময় গরুর গাড়ি চলতে শুরু করল। এমন সময় পেছন থেকে হাঁক পড়ল, 'ফটিক! ও ফটিক!'

ফটিক গাড়ি থামিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখল, কাজলী পড়ি কি মরি হয়ে হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে দৌড়ে আসছে। কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল রে ফটিক?'

---কাজলী দাঁড়াতে বলছে।

কর্ত্রী বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, 'চালা, গাড়ি চালা। ওর সাথে যা দরকার, তা পরে সেরে নিস।'

কিন্তু গাড়ি চালাবার আগেই কাজলী কাছে এসে বলল, 'চাচী! আমিও তোমার সঙ্গে যাব। ভাই ফটিক! একটু দাঁড়া।'

উত্তর বা অপেক্ষার দরকার নেই। বলার সাথে সাথেই কাজলী গাড়ির পিছনের ডাঁপ ধরে মারল এক লাফ। অমনি গাড়িতে উঠে ঘেরাটোপের পর্দা তুলে হাসতে হাসতে কর্ত্রীর পাশে গিয়ে বসল।

গাড়ি চলতে লাগল। কর্ত্রীর সর্বাঙ্গ যেন ঘিন্‌ঘিনিয়ে উঠল। যাকে দেখে হৃদে জ্বালা, সে হল গলার মালা! যাকে সে ঘিন বাসে, সে আজ

ভাতের পাশে! সে তো ইতিপূর্বে বহুবার হাসীনার কাছে ঐ বাড়িতে আনাগোনা করেছে। কৈ একটিবারও তো 'চাচী' বলে কুশল জিজ্ঞাসা করেনি। কর্ত্রী তাকে কী বলবে, তা রাগের মাথায় যেন হারিয়ে গেল। কিছু একটা ভেবে রাগ গোপন ক'রে বলল, 'তুইও শুনেছিস, বউমা খালাস হয়েছে?'

কাজলী গাল ভরে বলল, 'বাব্বা! আমার কাছে তার ছোট ভাই নিজে এসেছিল। সে তো সাইকেলে চলে গেল। আমি শুনলাম তুমি যাচ্ছ, তাই তাড়াহুড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। দেখ না, মাথার চুলটাও বাঁধা হয়নি। আর একটু দেরী হলে হয়তো সারা পথটা আমাকে একাকিনী হাঁটতে হত অথবা বাসের অপেক্ষায় বেলা চলে যেত।

কথাগুলি শুনে কর্ত্রীর মনটা যেন আরো বিষিয়ে উঠল। প্রকাশ্যে কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'আরে তার সাইকেলেই বেশ তো যাওয়া হত। আগেই পৌঁছে যেতিস।'

'তাও বটে! কিন্তু সে তো দাঁড়ায়নি যে সে কথা বলব। বলেই চলে গেল। আচ্ছা চাচী! এই জামাটা তোমার পোতাকে কেমন মানাবে বল তো?'---বলেই ব্যাগ হতে একটি জামা ও প্যান্ট্ বের ক'রে দেখাল।

কর্ত্রীর ওসব কিছু নেই। তার তো আশাই ছিল না যে, বিয়াই-বাড়ি যাবে ছেলে দেখতে। হঠাৎ যখন সুযোগ এল, তখন কীভাবে তা ক্রয় করা সম্ভব ছিল? আর সে তো বাজার ছাড়া হঠাৎ পাওয়াও যাবে না।

আর কাজলী? সে তো জেনে অপেক্ষাতেই ছিল। সে বাজারেও যায়। সপ্তাহান্তে গ্রামে জোলারাও আসে। তাদের সঙ্গেও তার বেশ জমে ওঠা ভাব। সেই তো পর্দানশীনদের মাঝে জোলাদের কাপড় বিক্রি করে। তাতে সে বখশীশও পায়। সে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়ে

রেখেছে, সখীর সন্তান দেখতে যাবে। তাই অজানার মাঝে ছেলে-মেয়ে উভয় শ্রেণীর পোশাক নিয়ে রেখেছে আগে থেকেই। আজ পুত্র সন্তানের খবর পেয়েই এই পোশাক কর্ত্রীকে দেখাল।

কর্ত্রী তো দেখে-শুনেই হতবাক! সে তো কোন উপহারই সঙ্গে আনতে পারেনি। এ তো বড় লজ্জাকর ব্যাপার। সেখানে গিয়ে যে চরম অপমানে পড়তে হবে, সে কথা সে তখনই অনুমান ক'রে নিল। মনে মনে আল্লাহর পানাহ চেয়ে কাজলীর কথার উত্তর দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, খুব সুন্দর! বেশ মানাবে তো।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু-চারটি কথার মাঝে গাড়ির পথ ফুরিয়ে গেল। দু'জনকে নামিয়ে দিয়ে গুড়-জল খেয়ে মাইন্দার বিদায় নিল। দু'জনেই এক সাথে বাড়ি প্রবেশ করল। হাসীনার কক্ষে প্রবেশ ক'রে কুশল বিনিময় করল। অতঃপর দু'জনেই শিশুকে কোলে তুলবার জন্য একই সাথে নিজ নিজ হস্ত প্রসারিত করল। এক দিকে সখী, হৃদয়-সঙ্গিনী। অপর দিকে মাতৃতুল্য শাশুড়ী। কিন্তু প্রকৃতিগত হৃদয়ের টানে হাসীনা সখীর দিকে পুত্রকে বাড়িয়ে দিল। শাশুড়ী মাতার হাত শূন্য থেকে বুকে ফিরে গেল।

কাজলী মুহূর্তের মধ্যে শিশুকে নিয়ে চুমু খেয়ে বুকে ক'রে নাচাতে লাগল। অন্য দিকে শাশুড়ী মাতা চরম লজ্জিতা ও বঞ্চিতা হল। ঘৃণায়, লজ্জায় এবং বধূ ও কাজলীর প্রতি রাগে তার দু'চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। বাইরে দাওয়ায় যেখানে আসন পাতা ছিল, সেখানে বসে কী যেন ভাবতে লাগল।

ভাববারই তো কথা। এত বড় অপমান কি এই বৃদ্ধ বয়সেও হজম করা যায়? আপন বধূ, আপন রক্তের শশীপুত্র। সকল ব্যথা-বেদনা

ভুলে, সকল কলহ-বিবাদ পঙ্কে প্রোথিত ক'রে, সকল অবজ্ঞা উপেক্ষা ক'রে বেহায়া নির্লজ্জের মতো এ ঘর এসেছে। কিন্তু তবুও সে বঞ্চিতা? যে আশা করেছিল, সে আশা ছিল দুরাশা?

কাজলী তখনও শিশুটিকে নিয়ে সোহাগ করছিল। তার বিবেকেও শিশুকে তার দাদীমার কোলে একবার তুলে দিয়ে দুআ নেওয়ার কথা গজাল না। পরক্ষণে সে এক হাতে ব্যাগ খুলে উপহারের জামা-প্যান্ট্ বের ক'রে আদর-গদগদ কণ্ঠে সোহাগ-বাক্য আওড়াতে আওড়াতে পরাতে লাগল। তা দেখে কর্ত্রী যেন অতিরিক্ত লজ্জায় ফাটলে প্রবেশ করতে চাইল। বাড়ি-ভর্তি লোক। কোথা হতে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেয়েটা কে?'

কোন একজন উত্তর দিল, 'হাসীনার সখী।'

পাশ থেকে কে বলে উঠল, 'দাদীমা কী নিয়ে এসেছে?'

পাশ থেকে কুমন্তব্য করতে খুব মজা। কে যেন বলে উঠল, 'কিছুই তো দেখছি না। খালি হাতেই এসেছে মনে হয়।'

অন্য একজন বলল, 'চোখে শরম থাকলে না আনতে হয়। সই এনেছে, আর শাশুড়ীর কোন শখ নেই? কৃপণ নাকি?'

---তা বৈকি। বড় লজ্জার কথা।

শরবতের গ্লাস বিয়ানের হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে কথার জবাব দিয়ে হাসীনার মা বলল, 'দেয়ার সময় কি চলে গেল নাকি? পরে দেবে। তাদেরই তো জিনিস।'

এ সকল কথোপকথন কর্ত্রী কর্ণপাত ক'রেই শুনছিল। সমস্ত কথাই যেন এক একটি তীর হয়ে তার কর্ণে বিদ্ধ হল। পথে সে যা আশঙ্কা করেছিল, এখন তা সত্যই ঘটে বসল। মনে মনে ভাবল, সে

এসেই বিপাকে পড়েছে। না এলেই ভাল হত।

প্রতিবেশী সম্পর্কের এক বিয়ান কর্ত্রীর সামনে এসে বলতে লাগল, 'কই হে বিয়ান! পোতা কি ন্যাংটা হয়ে থাকবে? তোমার জামা-প্যান্ট্ কই?'

এমন কথার খোঁচা যদিও অপমানজনক, তবুও এক প্রকার ভাল কর্ত্রীর জন্য। যেহেতু সে এর জবাবে নিজের ওজর ও আসল কথাটা বলার সুযোগ পেয়ে গেল। আর তাতে ব্যথার ভার কিছুটা হাল্কা এবং মান রক্ষা করার পথও পরিষ্কার হয়ে গেল। সে মুখ তুলে জোর গলায় বলতে লাগল, 'আসলে বউমার তো এ মাসে খালাস হওয়ার কথা ছিল না। তাই প্রস্তুতিও ছিল না। যে পায়ে খবর পেয়েছি, সেই পায়েই বেরিয়ে এসেছি। পথে বাজার থাকলেও হত। আর বউয়ের সই তো অনেক আগে থেকেই কিনে রেখেছিল। যাই হোক জামা-কাপড় দেওয়ার সময় তো চলে যায়নি। বাড়িতে ফিরে গেলে চাঁদির তাগা বানিয়ে দেব। বিছে বানিয়ে দেব। শুধু জামা-প্যান্ট্ কি?

কথাটা শুনে সমালোচক মহিলাদের মুখ জোঁকের মুখে লবণ পড়ার মতো হয়ে গেল।

ততক্ষণে কাজলী সোহাগ শেষ ক'রে শিশুপুত্রকে দাদীমার কাছে নিয়ে এসে বলল, 'চাচী! পোতাকে লাও।'

কিন্তু তখন দাদীমার আনন্দ ও আগ্রহের জোয়ারে ভাটা পড়ে এসেছিল। তবুও লৌকিকতা বজায় রাখতে হস্ত প্রসারিত ক'রে কাজলীর ক্রোড় হতে পৌত্রকে নিজ বক্ষে জড়িয়ে নিল। সেই সাথে পুরনো কথার অন্তর্দাহে তার বক্ষ দগ্ধ হচ্ছিল। এদিকে শিশুও কাঁদতে শুরু করল। কোন প্রকারেই দাদীমা তার কান্না থামাতে সক্ষম হল না।

অগত্যা বধূ এসে আপন শিশুকে বক্ষে জড়িয়ে দুগ্ধ পান করালে চুপ হয়ে গেল। কর্ত্রীর সোহাগ করা আর হল না। এ ক্ষেত্রেও সে নিজেকে বড় লাঞ্ছিতা ও বঞ্চিতা মনে করল। নিজেকে সত্যিই বড় হতভাগিনী মনে ক'রে ধিক্কারে নিষ্পিষ্ট হতে লাগল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বধূর মন যেন একটু সরল বলে অনুভূত হল। একবার ভাবল, আর একটি বার সে পৌত্রকে কোলে তুলে আদর করবে। কিন্তু পুনঃ কান্নার আশঙ্কায় সে কথা আর প্রকাশ করল না। পরক্ষণে বধূর মনে কী উদয় হলে সে নিজে থেকেই ছেলেকে শাশুড়ীর কোলে তুলে দিল। তখন কিন্তু শিশুটি আর কাঁদেনি। এবার কর্ত্রীর মনে আনন্দের সামান্য আভাস প্রকাশিত হল। বধূর মনেও যেন আহলাদের ফুলকুঁড়ি বিকশিত হল।

পাওয়া জিনিস হারিয়ে গেলে যত দুঃখ হয়, সেই জিনিসকে পুনরায় ফিরে পেলে ততোধিক সুখ বৃদ্ধি হয় নিরাশ মানুষের মনে। আজ শাশুড়ীর বোধ হয় তা-ই হয়েছিল। বধূর এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সে অতিশয় সন্তুষ্ট হল। যার নিকট থেকে কিছুই পাওয়ার আশা করা যায় না, তার নিকট থেকে এতটুকু পাওয়াও তো কম আনন্দের কথা নয়। মনে-প্রাণে-মুখে পৌত্র ও পুত্রবধূর জন্য 'দুআয়ে খায়র' করতে লাগল। পূর্বে কলহ-ঘটিত যত মনের গ্লানি ও ঘৃণা ছিল, সব যেন আজ বধূর সামান্য সৌজন্যমূলক ব্যবহারের ফলে ধুয়ে-মুছে গেল। কী জানি? বধূর মন থেকে তা দূর হয়েছিল কি না?

কর্ত্রীর মনের আকাশ পরিষ্কার হল বটে, কিন্তু কাজলী সম্বন্ধে চিন্তা করতেই সেই আকাশে ঝড় বইতে লাগল। কোন এক অনভিপ্রেত অঘটন ঘটার আশঙ্কার কথা চিন্তা ক'রে তার মুখমণ্ডল আবার ভারী

হয়ে গেল। ইতিমধ্যে যাকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা সেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'হায়-হায় চাচী! তোমার কাপড়ে বাবুটা পেশাব ক'রে দিল। এবারে কী ক'রে নামায পড়বে?'

কর্ত্রী বলল, 'তা করুক। পেশাবের জায়গায় পানির ছিটা দিলেই নামায পড়া হবে। এখন মাত্র দু'দিনকার খোকা। অবশ্য খুকী হলে হত না।'

নামাযের সময় আসন্ন দেখে হাসীনা শিশুকে শাশুড়ী মাতার কোল থেকে তুলে নিয়ে সখীর কোলে দিল। তাতে কর্ত্রীর বলার কিছু ছিল না। সে তৎক্ষণাৎ নামাযের উদ্দেশ্যে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

সেদিন সকালে বাড়ির সকলের অনুরোধ সত্ত্বেও কর্ত্রীর আর থাকা হল না। মতী এলে শিশুর নামকরণ ও আকীকা হবে, তাতে থাকা তো জরুরী ছিল তার। কিন্তু তার বাড়িতে তো বৃদ্ধ একা ছাড়া অন্য কেউ নেই। তাই গাড়ি এলে সে সকলের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে পৌত্রকে দুআ দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। আর শাখা-প্রশাখাহীন কাজলী সখীর অনুরোধে আরও কয়েকটা দিন থেকে গেল। যা কর্ত্রীর মোটেই পছন্দ ছিল না।

আকীকার দিন মতী শ্বশুরবাড়ি এল। সেদিন তার আব্বাও এল। কিন্তু ঐ একই ভুল ছিল যে, পৌত্রের জন্য কোন উপহার আনা হয়নি।

রাত্রে হাসীনা মতীকে বলল, 'সাত পরে কত উপহার দিয়ে যাচ্ছে। আমার মায়ের বাড়ি লোকেরা একটা একটা ক'রে খুশীর সাথে উপহার দিয়েছে। আর তোমার মা-বাপ ও অন্যান্য আত্মীয়রা একটা চুষুনী পর্যন্ত উপহার দিতে পারল না?'

সুমতিপ্রাপ্ত ছেলের মতো মতী উত্তর দিল, 'দেখ হাসীনা! এই তুচ্ছ

জিনিসকে কেন্দ্র ক'রে আবার অশান্তি ও বিরোধ সৃষ্টি করো না। যারা দিয়েছে, তারা আসলে ঋণ দিয়েছে অথবা পরিশোধ করেছে। আর আমরা তো বাপ-মায়ের কাছেই ঋণী। পরিশোধ তো আমাদেরকেই করতে হয়।'

'আমি জানি তো, মতী সাহেবের মতিভ্রম আর দূর হবে না।' এই বলে পার্শ্ব ত্যাগ ক'রে হাসীনা ঘুমাবার চেষ্টা করল।

(৩)

সন্তানসহ বউমা গৃহে ফিরেছে। আনন্দের বন্যা সকলের মনে। এখন যেন শাশুড়ী-বধূর তন-মন এক। সকলের দুঃখ এক, দুশ্চিন্তা এক, সুখ এক, সুচিন্তা এক। পুত্রের বিবাহ দিয়ে প্রত্যেক পিতা-মাতা যেমন আনন্দের সংসার চায়, একটি নতুন কন্যা চায়, সেই সুকন্যার সুন্দর আচরণ ও চরিত্র চায়, মনোমুগ্ধকর ব্যবহার চায়, তার মন চায়, তার হাসি চায়, তার খুশী চায়, তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা চায়।

শ্বশুরবাড়ি এসে যেমন নববধূ নতুন একটি মাতা চায়, পিতা চায়। বন্ধুরূপে পেতে চায় স্বামী ও ননদকে। সুখ চায়, সমৃদ্ধি চায়। দুঃখে-শোকে সান্ত্বনা চায়। আজ যেন এ বাড়িতে সে সব আছে। এ বাড়ির আনাচে-কানাচে যেন সুখের লহরী বয়ে চলেছে।

এ বাড়ির সদস্যরা এখন পরস্পরে পরামর্শ ক'রে কাজ করে। চাপের কাজ ভাগ ক'রে নেয়। এ বাড়িতে আর কোন দাসী নেই। এখন সবাই সবারই সেবাদাসী। কি জানি এ মনোরম সুখ এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল? এ বৎসরে কোথা হতে যেন নবজাত শিশুর আগমনের সাথে সাথে সেই হারানো সুখের আবির্ভাব ঘটল।

হাসীনার (সুন্দরী) নামের সাথে রূপের বেশ মিল আছে, তবে কর্মের নয়। হাসীনা দেখতে অপরূপা, তার মতো তার শিশুও অপরূপ সুন্দর। দেখলেই নয়ন জুড়িয়ে যায়। সম্ভবতঃ এই মিল থাকার জন্যই তার নামও রাখা হয়েছে 'আহসানুজ্জামান' (যুগসুন্দর)।

কর্ত্রীর শয়নকক্ষের দাওয়ায় শয়নাবস্থায় আহসান হস্তপদ ছুঁড়ে খেলা করছিল। এই শৈশবকালই তো মানুষের সর্বোত্তম কাল। এই তো খুশীর সময়। কোন চিন্তা নেই, ভাবনা নেই, ভয় নেই, পাপ নেই। কেবল কান্না দেখালেই মন ভরে যায়, পেট পূর্ণ হয়ে যায়। হাসীনার নয়নমণি হাসির ফুল বর্ষণ করছিল। যেন প্রকৃতির শতরূপ দেখে অথবা দাদা-দাদী ও পিতা-মাতার অপার স্নেহ-বাৎসল্য দেখে সে চরম উল্লাসে উল্লসিত ছিল।

কর্ত্রী পৌত্রের সামনে বসে করতালি দিয়ে তাকে আরো উৎফুল্ল ক'রে তুলছিল। তার নিজের আনন্দও যেন দেহে ধরছিল না। আরও হত, যদি মুখে কথা ফুটত। সুতরাং সেই আশায় সে শিশুকে শিক্ষা দিতে শুরু করল।

---আব্বু! বল তো, 'মা----।'

শিশুর জন্য দুনিয়ার সবচেয়ে প্রথম ও সবচেয়ে মিষ্টি শব্দ 'মা'ই। এই জন্যই মনে হয় দুনিয়ার প্রায় সকল ভাষাতেই মায়ের জন্য প্রথম অক্ষরে 'ম' শব্দই ব্যবহার হয়েছে। সেই জন্যই দাদীমা হয়েও কর্ত্রী 'মা' বলার প্রশিক্ষণ সর্বপ্রথম শুরু করল।

শিশু বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে বলল, 'ম----।'

---বল, 'মা----।'

---'ম-অ----।'

পুনরায় শিশু হাসতে লাগল। মধুর হাসি, মিষ্টি হাসি, চিত্তাকর্ষী হাসি!

ইতিমধ্যে কর্তা হাসতে হাসতে বাড়ি প্রবেশ করল। সোজা পৌত্রের কাছে এসে বলল, 'কই আব্বু! তুমি কী করছ?'

শিশু আর কী বলবে? কর্ত্রী বলল, বল, 'খেলা করছি।' বল তো, 'দা-দা---।'

---দা-দা---।

দূর থেকে হাসীনাও লক্ষ্য করছিল সেই শৈশবের খেলা। সকলের হৃদয়ই আনন্দে পুলকিত হল।

রাত্রে কর্তা-কর্ত্রী নানা আলোচনার মাঝে বধূর কথাও উঠল। দেখল, তার সকল দুর্মতিই যেন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ দুশ্চরিত্র সখীর সাহচর্য বর্জন করছে না। যে মন তার ভালবাসায় উতলা হয়ে উঠেছে, সে উন্নাসিক মন এত সতর্ক করার পরেও তাকে বর্জন করতে পারছে না। কী জানি, কখন হয়তো কোন দুর্ঘটনা ঘটে বসবে। হয়তো সুখ বসন্তের এ ফুল বাগানে কোন সময় তুফান বয়ে যাবে।

সারা দিনের মধ্যে সে একবারও আহসানকে সাথে নিয়ে যায়। পাড়াবেড়ানী মেয়ে দুধের শিশুকেও নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ায়। কর্ত্রীর বদনজর লাগার ভয় হয়, রূপার তাগা ইত্যাদি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও হয়। তারা ভাবতে লাগল, তার এ বাড়ি আসার পথে কাঁটা পড়বে কীভাবে? এ বাড়ির দরজা তার জন্য বন্ধ করা যাবে কেমন ক'রে?

বধূ তখনও পৃথক। এত সুখের পরেও কিন্তু একান্নবর্তী হয়ে যাওয়ার কোন ইঙ্গিতই সে দেয় না। কর্তা-কর্ত্রী ভাবে, এক সংসার করলেই ভাল হয়। আবার ভাবে, হয়তো বা এক সংসার করলে

পুনরায় সেই কলহ, সেই অশান্তি ফিরে আসবে। তার চাইতে যতটুকু তারা পেয়েছে, ততটুকুই অনেক পাওয়া। নচেৎ সবটুকু চাইতে গেলে হয়তো সবটুকুই হারিয়ে যাবে।

কখনো মনে হয়, বধূ যেটুকু করছে, সেটুকু হয়তো সাময়িক অভিনয় ও ললনার ছলনা মাত্র। ইচ্ছা করলে সে চিরসুখিনী হতে পারত; কিন্তু তার চরিত্রে যদি ভ্রষ্ট কাজলীর চরিত্রের দাগ একবার লেগে যায়, তাহলে সকলের জীবন যে কত বড় দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, তা কল্পনা করতেই গা শিউরে ওঠে। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, আর অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'---শিক্ষিত মেয়ে এ কথা জানা সত্ত্বেও কেন নিজের ভুল বুঝতে পারছে না এবং ছেলেই বা কেন তাকে বুঝাতে পারছে না, তা তারা নিজেরাই বুঝতে পারছে না।

পক্ষান্তরে কোন অঘটন না ঘটলেও একজন ভাল ঘরের মহিলা একজন খারাপ মহিলার সঙ্গে মিশতে যাবে কেন? আসলে কাজলী যে খারাপ মহিলা---এ কথা হাসীনা বিশ্বাসই করে না। সে জানে কাজলী বড় স্মার্ট, বড় উন্মুক্ত মনের, বড় সভ্য, বড় আমুদে, আর সুন্দরীও। তাছাড়া সে লেখাপড়া জানে। বই পড়ে। সেই জন্যই তাকে তার বড় পছন্দ। আবার এ বাড়িতে মহিলা বলতে একজন বৃদ্ধা ছাড়া কেউ নেই। কোন ননদ নেই। স্বামীও বাড়িতে থাকে না। সুতরাং যার সাথে কথা বলে ও যার কথা শুনে মজা পাওয়া যায়, এমন একজন মনের মতো সঙ্গিনী না হলে কি বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ থেকে হাসীনার কালাতিপাত হয়? তাই 'মনে মনে মিল, তো লেগে গেল খিল।'

দিন এইভাবে কেটে যায়। ধীরে ধীরে আহসানুজ্জামান অস্ফুট স্বরে আধো আধো ভাবে 'মা-আব্বা-দাদা-দাদী' বলতে শেখে।

অধিকাংশে 'দাদা' কথাটাই তার মুখে বেশী উচ্চারিত হতে থাকে। কারণ, সে এখন দাদার কাছেই বেশী থাকে। খাবার সময় ছাড়া অন্য সময়ে সে যেন দাদার কোলেই বেশী শান্ত-শিষ্ট থাকে। কত খেলা করে, কত কথা বলে। দাদাও পোতার প্রতি বেশ আসক্ত হয়ে পড়ে। বাইরে থেকে বাড়ি প্রবেশ করলে প্রথমে খবর নেয় তারই। আর তাতেই থাকে তাদের আনন্দের আমেজ।

সন্ধ্যাবেলায় তখনও আহসান ঘুমায়নি। সেই একই ধারায় পিতামহ-পৌত্রে খেলা করছিল, কথা বলছিল। ইত্যবসরে বধূ এসে বলল, 'আহসান খেলা করছে, থাক। আমি একটু বাইরে থেকে আসি।'

এমনই প্রয়োজন সন্ধ্যাবেলায় প্রায় সেই স্ত্রীলোকদের পড়ে থাকে, যাদের বাড়িতে পায়খানা নেই। কর্তার বাড়িতে পায়খানা আছে, তবুও খোলা মাঠে পায়খানা করতে এক শ্রেণীর মজা পায় অনেক মহিলা। শ্বশুর কিছু চিন্তা না ক'রে সম্মতি জানিয়ে দিয়ে বলল, 'বেশ, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে।'

'আচ্ছা' বলে বধূ বের হয়ে গেল।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথে পাড়া সম্পর্কে এক ননদের সাথে তার দেখা। পুকুরের ঘাটে উযূ করতে নামার সময় হঠাৎ আবছা অন্ধকারে হাসীনা-ভাবীকে কোথাও যেতে দেখে সে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ভাবী! কোথায় চললে?'

---মাঠের দিকে?

---একা? আমি যাব সাথে?

---না দরকার হবে না।

---সুন্দরী অন্ধকারে একা চলতে ভয় করে না?

---তুমিও তো সুন্দরী।

---তোমার মতো নই। আমাদের ও বলছিল, 'হাসীনা ভাবী যদি নামাযী হত, তাহলে আরো সুন্দরী লাগত।'

---তা কীভাবে?

---বা-রে! দুই শ্রেণীর সৌন্দর্যের যোগ হত।

---আমি যাই, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

হাসীনা চলতে লাগল। সে রাত্রে চন্দ্র উদয় হতে তখনও বিলম্ব ছিল। আকাশে তারকা শোভাবর্ধন করছে সেই সন্ধ্যার। কথামতো প্রতিশ্রুত জায়গায় গিয়ে মিলিত হল কাজলীর সাথে। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য তারকা ফুটেছে। কী জানি, দুই যুবতীর মনের গহিন আকাশে সংগোপনে কিসের তারকা ফুটছিল? কিসের পুলক তাদের সর্বশরীরে শিহরণ জাগাচ্ছিল?

হাসীনা বলল, 'কী অন্ধকার মাঠে!'

কাজলী হেসে বলল, 'মনটাও কি?'

হাসীনা বলে উঠল, 'আঁধারে আলো।'

পরক্ষণে কাজলী কী ভেবে চমকপ্রদ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা সখী! আজ শনিবার নয়? মতী ভাই আসবে না?'

হাসীনা আকাশের দিকে মুখ তুলে যেন কয়েকটা তারা গণনা ক'রে বলল, 'না, পরশু চিঠি এসেছে। তার পরীক্ষা। এখন বোধ হয় দিন পনের আসবে না।'

'তাই নাকি? তাহলে বড় অসুবিধা দেখছি তোমার।' কথাটি বলেই কাজলী দুষ্টের মতো হেসে উঠল।

হাসীনা অর্ধ স্বরে বলল, 'আরে আস্তে আস্তে! এই অন্ধকারে এত জোরে হাসলে লোকে কী বলবে?'

---ছাই বলবে। তারা হাসে না নাকি? আর আমি কারো বাবার বউ নই যে, আমাকে কিছু বলতে আসবে।

পুনরায় বলল, 'সই! একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, কী জানো?'

---জানাও।

---তোমার প্রথমে বিয়ের কথা কোথায় হয় জানো?

---সবটা না। তবে এই গ্রামেই, সেটা জানি। কেন? কী হয়েছে?

---এমন কিছু নয়। সেই ছেলেটাই তোমার কথা বলছিল। তার নাকি তোমাকে এক নজর দেখার বড্ড শখ। সত্যি, তোমার বিয়েটা যদি ওর সাথেই হতো, তাহলে অতি মনোহর নাগর পেতে। একেবারে সোনায় সোহাগা হতো। কিন্তু ওই যে কথায় বলে না, 'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর, আর অতি বড় ঘরনী না পায় ঘর।' তার সঙ্গে দেখা করবে একবার?

---না সই! খবর পেলে আর রক্ষে নেই।

---কোন ভয় নেই তোমার। কেবল একবার তাদের বাড়ির সামনে বেয়ে পার হতে হতে সাক্ষাৎ ক'রে নেব। সে প্রায় সময়ই তাদের বাড়ির বৈঠকখানাতেই থাকে। আর কারো সাথে দেখা হবে না। কেউ জানতেও পারবে না।

সখীর মিষ্ট বাক্যে হাসীনা প্রলুব্ধা হল। মনে মনে সেই যুবককে এক নজর দেখার শখ তারও মনে জেগে উঠল। কিন্তু কী যেন ভেবে বলল, 'বেশ তো, আজ নয়। অন্য কোনদিন দেখা যাবে।'

আংশিক মাঠ পার হয়ে এক ধারে কাজলীদের বাড়ি। গল্প করতে করতে বাড়ির কাছে এসে বলল, 'এই তো আমাদের বাড়ি। এতক্ষণ

গল্প অল্পই হল। এবার তোমাকে উপকথা রূপকথা অনেক শোনাব। আমার মা অনেক কেচ্ছা জানে।'

সখী প্রতিশ্রুত সময়ের কথা ভুলে গিয়ে সায় দিয়ে বলল, 'ভালো।'

একটি রূপকথার প্রায় অর্ধেকখানি শেষ হল, '---সেই রাজপুত্রের বিরহে রাজকন্যা কেঁদে কেঁদে বনে ফিরতে লাগল।' এমন সময় ও পাড়ার শিউলী দৌড়ে এসে বলল, 'ও ভাবী! তুমি এখানে খোশ গল্প শুনছ। আর ওদিকে তোমার শ্বশুর তোমার উদ্দেশ্যে খুব বকাবকি করছে দেখগে যাও। আহসান খুব চিৎকার ক'রে কান্না শুরু করেছে। কোন মতেই চুপ হচ্ছে না। কখন এসেছ বল তো? আবার ঘরের বার দরজাটাও বন্ধ ক'রে আসনি। কুকুর ঢুকে রান্নাশালের হাঁড়িতে মুখ দিয়ে ফেলেছে।'

হাসীনা লম্বা ক'রে জিভ বের ক'রে সখী ও তার মায়ের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করল।

ত্রস্তপদে বাড়ি প্রবেশ করার আগেই শ্বশুর-শাশুড়ীর নানা সমালোচনা শুনতে পেল। শাশুড়ী বলছে, 'আসলে জাতের মেয়ে নয় যে। তা নাহলে আবার ঐ ঢেমনের সাথে মিশে গাঁ বেড়াতে যায়? দেখবে আমাদের মান-ইজ্জত মাঠ-ময়দান করবে। জাতের মেয়ে হলে সেসব বুঝত---।'

হাসীনা অন্যায় করলেও তার সহিষ্ণুতা আদৌ নেই। শ্রুত কথায় তার সর্বশরীর যেন জ্বলে উঠল। অতঃপর যে বাগ্‌যুদ্ধ বাড়ির ভিতরে শুরু হল, তা অবর্ণনীয়। সেই পুরনো ছাই চাপা আগুন যেন ইন্ধন পেয়ে পুনরায় দপ্‌ ক'রে দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। কান্নারত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে দ্বিতলে স্বকক্ষে প্রবেশ ক'রে ফুলে ফুলে কেঁদে

উঠল। সর্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা অনুভব করার মতো শক্তি তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করতে লাগল। শ্বশুরালয়ে যে সকল কটু কথা সে শুনেছে ও শুনছে, ইতিপূর্বে কখনো শুনেনি। কোনদিন কল্পনাতেও ভাবেনি যে, অন্যের শাসনের বেড়া ভাঙ্গলে মানুষকে এইভাবে কথা শুনতে হয়। আদরিনী যেন চায় যে, সকলেই তার মনের চাহিদা মিটিয়ে চলুক। স্বেচ্ছাচারিণী চায় না যে, নিজের স্বাধীনতায় কোন বাধা পড়ুক। অথচ তার জানা থাকার কথা যে, অবাধ স্বাধীনতা পুণ্যময়ী স্ত্রীকেও নষ্ট ক'রে ফেলে।

প্রায় সমগ্র রাত্রিটাই চোখের পানি বইয়ে অতিবাহিত হল। শব্দহীন ভাষায় কত কথা মনে ক'রে চরম দুঃখ ও ঘৃণায় সুনয়নার নয়নযুগল প্রবহমান থাকল।

কী জানি? তার ভাগ্যে কেন এমন কষ্টের দূর পাল্লা? স্বামীর নিকট অতি সোহাগিনী সে, কিন্তু সেকেলে শ্বশুর-শাশুড়ীর নিকট এত অবহেলিতা কেন? হাসীনা মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেই ফেলল যে, সে জীবন ভর আর তাদের শাসন-বেড়ায় পরাধীনা থাকবে না। কারণ, তাদের সংস্পর্শে থাকলে তার ফুলবৎ জীবন কাঁটাবৎ হয়ে উঠবে। স্বামীর নিকটে যতটুকু প্রেম-ভালবাসা পায়, নারী-জীবনে তো সেইটুকুই যথেষ্ট। আবার কী? যে স্বামীর ভালবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছে, তার অন্য কারোর ভালাবাসার প্রয়োজন নেই। যে স্বামীকে হাত করতে জানে, তার আয়ত্তে সকল কিছু। স্বামীর আত্মীয়রা যদি তার কদর না করে, তাহলে সেই বা কোন্‌ নৈতিকতা পালন ক'রে তাদের কদর করবে?

অনেক বেলা হলে হাসীনা সখীকে কারো দ্বারা ডেকে পাঠাল। সখী এসে গত রাত্রের কলহ শুনে বিস্মিতা হল। হল বটে, কিন্তু সে ঘটনা তার

মনে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করতে পারেনি। ঘটনাটার এক নায়িকা যে সেও, তা সে ভাবতেও চায় না। শুধু গালভরা হেসে বলল, 'কী দরকার ওদের কাছাকাছি থাকা। তুমি আলাদা থাকলেই স্বাধীন থাকবে।'

অতঃপর সখীর সহায়তায় সেদিনকার রান্নার কাজের যাবতীয় ব্যবস্থাপনায় মনোযোগী হল।

হাসীনার ঘোর তখনও কাটেনি। রাত্রের কলহের জন্য প্রকৃত দোষী কে, তা নিরূপণ করতে নিজেকে বাদ দিয়ে অন্যকে নিয়ে চিন্তা করতে করতে কাজ করছিল। কাজে বিরক্তি আসে। আহসান আজ তারই কাছে। সে কেঁদে উঠলে বিরক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। কাজ শেষ করতে চাইলে যেন তা আরো বেড়ে যায়। মনে রাগ হয়, ধিক্কার হয়। আর তার সুখ হরণের মূলে দায়ী করে কেবল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে।

আহসানকে নিচের তলায় শানে বসিয়ে রেখে কাজলী রান্নার জন্য ও পাড়ার কুয়া থেকে পানি আনতে গিয়েছিল। হাসীনা দ্বিতলে বিছানা-পত্র ঝেড়ে তুলে রাখছিল। কারণ, তার ইচ্ছা বিকালের দিকে কাজলীকে সঙ্গে ক'রে পিত্রালয়ে চলে যাবে। এখানে আর নিমেষের জন্যও থাকতে মন চায় না। যারা তাকে কটু কথা শুনিয়েছে, তাদের চোখে চোখ দিতে এবং তাদের ছায়া মাড়াতেও ইচ্ছা হয় না। স্বামীও এখন বাড়ি আসবে না। তবে এত দুঃখের কথা বলবে কাকে? কে-ই বা তার যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? যদিও সখী তার হৃদয়-সঙ্গিনী, তবুও সে সান্ত্বনা ও পরামর্শ ছাড়া তার শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ তো করতে পারছে না।

ঠিক এই সময়ে গৃহকর্তা বাড়ি প্রবেশ করলে, তাকে দেখে আহসান 'দা-দা, দা-দা' বলে হামাগুড়ি দিয়ে তার দিকে যেতে লাগল। তা দেখে দাদা তাকে কোলে তুলে নিয়ে পূর্বের মতো আদর করতে লাগল।

প্রতিদিনের মতো তার সাথে কত কথা বলতে লাগল। আলমারীর বয়েম হতে একটি বিস্কুট হাতে দিয়ে রোয়াকে একটি মোড়ার উপরে বসে তাকে জানুর উপরে বসিয়ে পুনরপি সোহাগ করতে লাগল। ইত্যবসরে অকস্মাৎ বধূ এসে ঈগলের মতো ছোঁ মেরে ছেলেকে তার দাদার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পা ঠুকতে ঠুকতে দ্বিতলে উঠে গেল। আহসান 'দা-দা, দা-দা' ক'রে কাঁদতে লাগল। কান্না দেখে তার রাগ হল। তার হাত থেকে বিস্কুটটি কেড়ে নিয়ে আঙিনায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে আরো জোরে কাঁদতে লাগলে পিঠে একটি থাপ্পড় মেরে মেঝেতে ঠুকে বসিয়ে দিল।

সেই সময় কাজলী এসে 'হায়, হায়' করতে করতে তাকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল।

বৃদ্ধ কর্তার হৃদয়ে সেদিন কতখানি আঘাত লেগেছিল জানি না। তবে বধূর আচরণে তার চক্ষুর অশ্রু বাধ মানল না। ওষ্ঠাধর যেন কেঁপে উঠতে লাগল। হয়তো বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ বলেই ধৈর্যের সাথে সে এত বড় ধাক্কা সয়ে নিতে পারল। নচেৎ অন্য কিছু ঘটতে পারত। আফসোস ক'রে বলল, 'তোমার এ কী আচরণ বউমা! তুমি কী গুরুজন বলে কিছু মান না?'

বধূ গত রাত্রের কথার জের টেনে জবাব দিল, 'জাত-ওয়ালা হয়ে বজ্জাতের ছেলেকে কোলে তোলা কেন? আমি যদি জাতের মেয়ে না হই, তাহলে ছেলেটা আবার জাতের হল কী ক'রে? আমার চরিত্রে সন্দেহ থাকলে ওকে তোমার বেটার ছেলে নয় বলে ঘৃণা করতেও তো পার।'

এসব কথার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই সে বলতেই থাকল, 'খবরদার আমার ছেলের গায়ে কেউ হাত দেবে না। আমার ছেলে মরে গেলেও কেউ দেখতে আসবে না। আমি যাদের কেউ নই, আমার

ছেলেও তাদের কেউ নয়।----'

বৃদ্ধা বৃদ্ধকে বধূর কথার উত্তর দিতে নিষেধ করল। বৃদ্ধ বড় অবাক হল। এমন বাক্-পটিয়সী মেয়ে মানুষের কথা সে যেন আজ প্রথম শুনল। উত্তরে কী আর বলবে? আপন যখন পর হয়েছে, তখন পর কী ক'রে আপন হয়? পুত্রই তো তার বুকের পাটা বাড়িয়েছে। তবে কে তার প্রতিবাদ করবে? ঝরনা-ঝরঝর চক্ষু নিয়ে বৃদ্ধ বাইরে বের হয়ে গেল। যেহেতু বধূর বিষবাক্যের আঘাত ছিল বড্ড গভীর, বড় মারাত্মক হৃদয়-বিদারক।

মনে মনে স্থির করল, কষ্ট হলেও আর সে আহসানকে তাকিয়ে দেখবে না।

'পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে,
শাখা আবার চায় কি তাহার পানে?'

প্রাণের টান এবারে যেন চির বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এ সংসার নয়, এ যেন ফারসীর 'সাংসার', যার অর্থ পাথর মারা। না জানে আর কত কথার পাথর খেতে হবে তাদেরকে?

(৪)

মাগরিবের আযান হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে সখীর সাহচর্যে পিত্রালয়ে প্রবেশ করল অভিমানী হাসীনা। ইতিপূর্বে গৃহ যেন শব্দহীন শান্তির নীড় ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তাদের আগমনে যেন গৃহময় কিসের হৈচৈ পড়ে গেল। এ বাড়ি সে বাড়ি ও প্রতিবেশীর আরো অন্য বাড়ি থেকেও বহু মহিলা সে বাড়িতে কী অত্যাশ্চর্য জিনিস দেখতে আগমন

করল। ঘটনার বিবরণ শুনে 'কী, কেন, কীভাবে' ইত্যাদির নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে আপন আপন সৌহার্দ, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা প্রকাশ ক'রে কেউ বা 'আহা', কেউ বা 'ছিঃ-ছিঃ', আবার কেউ বা হাসীনার শ্বশুর-শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে নিজ অভ্যাসগত গালাগালি ও কটুবাক্য প্রয়োগ করতে লাগল।

হাসীনার পিতা-মাতা তো অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিন্তা-কর শিরে স্থাপন ক'রে কী যেন ভাবতে লাগল। একবার নয়, দুইবার নয়, বারবার যদি এই শ্রেণীর আচরণ তাদের নিকট থেকে প্রদর্শিত হয়, তাহলে তো কন্যার সুখনীড় অগ্নিগর্ভে যাওয়ারই কথা। প্রতিবাদে কলহ দ্বিগুণ হবে, পরন্তু নীরব-নিষ্ক্রিয় থাকলেও কোন সমাধান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে না ভেবে কোন এক সালিসী ব্যবস্থার মাঝে শান্তি আনয়নের উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল।

আদুরে হাসীনা তো কেঁদেই আকুল। তার অভিপ্রায়, যতদিন মতীর মা-বাপ থাকবে তাকে যেন আর কোনদিন তাকে ঐ বাড়িতে পা দিতে না হয়। অবশ্য স্বামী তার মনের মত। সে ভাল বাসুক চাহে না বাসুক, সে তাকে সীমাহীন ভালবাসে। তবে সে যদি তাকে নিয়ে সংসার করতে চায়, তাহলে ঐ বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে সরাতে হবে অথবা তাদের নিকট থেকে সরে আসতে হবে। নচেৎ কথায় কথায় মুরগী-লড়াই ক'রে সহাবস্থানের মাঝে কোনদিন তারা শান্তি পাবে না।

বাড়িটা যেহেতু মতীর নামে লেখা আছে, সেহেতু হাসীনার মনে জোর আছে। প্রতিবেশীর 'মেয়েদের-সেরা-মেয়ে'দের নিকট হতে সে চরম উৎসাহও পেল।

রাজীবের মা বলল, 'ওই জন্যই আমি রাজীবের আব্বাকে বলে

বলে বাড়িটা আমার নামে লেখা করিয়েছি। তুইও তোর নামে করিয়ে নিবি, তাহলে আর কেউ দাপট দেখাতে পারবে না।'

নিলোফারের মা বলল, 'এবারে রাজীবের বউ এলে সেও রাজীবকে পটিয়ে পটিয়ে বাড়ি নিজের নামে করতে চাইবে। তাহলে তোমার লাভ কী হবে? আসলে মিল থাকলে আল্লাহর বন্টন করা ভাগ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে কোন কলহ বাধে না।'

একজন বলল, 'ঐ শ্বাশুড়ী আমার পাল্লায় পড়ত, তাহলে ওর নাভিকুণ্ডে ধান রেখে আমি চাল বের করতাম!'

আরো কত ধরনের আলোচনা-সমালোচনা-পর্যালোচনা চলতে লাগল সেই সন্ধ্যায়। একটি সমস্যা বিভিন্ন মতে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। সকলেরই চিন্তা-ভাবনা ও সমাধান ভিন্নমুখী হয়ে প্রাধান্য পেতে চায়। তাহলে কী রূপে সঠিক সমাধান করা যেতে পারে? সকলেই নিজের স্বার্থে কথা বলে। সকলেই নিজেকে দোষমুক্ত এবং প্রতিপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায়। অতএব এক পক্ষের কথা শুনে কি আর বিচার ও ফায়সালা হয়? বাদী-প্রতিবাদীর পারস্পরিক অভিযোগ ও উত্তর না শুনেই পিতামাতা চায় নিজের মেয়েকে নিষ্কলঙ্ক পূর্ণেন্দু মানতে। প্রায় প্রত্যেক মা-বাবাই মেয়ের কথা শুনে জামাই পক্ষের লোকজনকে দোষারোপ করে। যেমন প্রায় প্রত্যেক ছেলে পক্ষের আত্মীয় স্বজন কলহের সময় কেবল বউ এবং তার মা-বাবার দোষই প্রমাণ করতে চায়। আর মাঝখান থেকে উভয় পক্ষকে ক্ষান্ত ও শান্ত করতে ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয় সে, যার হাতে আছে বিবাহের ডোর।

অনেক কনেপক্ষ জামাতাকে দোষারোপ করে, কাপুরুষ বা ভেড়া ভাবে। কিন্তু মহিলা-মহলের সে দ্বন্দ্ব এত তিক্ত, এত জটিল যে, তার

মীমাংসা উচ্চ আদালতের পক্ষেও সম্ভব নয়।

হাসীনার পিতা শান্তির তল্লাশে নিরপেক্ষ ফায়সালায় জামাতার ভূমিকার কথাই চিন্তা করছিল। এমন সময়ে স্ত্রী বলে উঠল, 'দরকার নেই। আমার মেয়ে আমার ঘরেই থাক। কেন পরের ঘরে এত গঞ্জনা-ভর্ৎসনা সইতে যাবে? দরকার হলে তালাক নিয়ে নেব!'

---জামাই আসুক। শোনা যাক, তার মতামত কী?

---তার মর্দানি কোথায়? সে শক্ত হলে কি এমন হয়?

একটু দূরে কাজলী বসে ছিল। সে কাছে এসে সম্মুখে বসে বলল, 'না মা! জামাই তোমাদের খুব ভাল। সে একদম মাটির মানুষ। তাকে দোষ দেওয়া মোটেই ঠিক হবে না। তবে প্রতিবাদে সে কিছু বলতে-করতে পারে না তাই। যতই হোক মা-বাপ তো।'

---মা-বাপ হল তো কী হল? অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারলে সে আবার ভাল কীভাবে?

---সে কথা ঠিকই মা! কিন্তু সে উপস্থিত থাকতে তো আর এমন কাণ্ড ঘটে না। ঠিক যখন সে বাড়িতে থাকে না, তখনই চলতে থাকে খুটখাট। আসলে হাসীনার শাশুড়ী বড় চোখজ্বলা বুড়ি। পুরনো যুগের মেয়েরা আধুনিকতা দেখতে পারে না। নামাযী তো, তাই বেনামাযী দেখতে পারে না। আমার মত বলে, হাসীনা এমনভাবে পৃথক থাকবে, যাতে বিলকুল ঐ বুড়োবুড়ির চোখে চোখই না পড়ে। তাহলেই সখী সুখে থাকবে। তারপর তো তোমাদের জামাই আশা করি আগামী বছরে চাকরী পেয়ে যাবে। তখন তো হাসীনার কত সুখ। এখন সবারই উচিত, জামাইকে হাত করা। কারণ, তার নামেই অনেক কিছু আছে। আর সে হাত হলেই বাজিমাত।

কাজলী যুবতী হলেও তার বুড়ির মতো এমন প্রস্তাব ফেলবার নয়। প্রায় সকলের পক্ষ থেকে সর্বান্তঃকরণে তা সমর্থিত হল। এখন শুধু জামাতার প্রতীক্ষা রইল।

(৫)

মতীর হৃদয়খানা বিষাদে পরিপূর্ণ। ভেবেছিল, বাড়ি প্রবেশ করতেই আহসান 'আব্বা-আব্বা' বলতে বলতে কোলে আসবে। কিন্তু কোথায়? বাড়ি একেবারে নিঃঝুম। রুমে রুমে তালা ঝুলছে। পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা ক'রে যে জবাব পেল, তাতে তার ধারণা পাকা হয়ে গেল যে, নিশ্চয় তাদের সাথে আবার ঝগড়া হয়েছে।

শ্বশুর-বাড়ির পথে তার মন চিন্তাকুল। না জানে কত লাঞ্ছনা তাকে সইতে হবে, কত ভর্ৎসনা তাকে শুনতে হবে, কত নরম-গরম কথাই তাকে কানে তুলো গুঁজে শুনতে হবে।

তা হবে না আবার? সে যখন বাড়ির রোয়াকে রাখা তক্তার উপরে গিয়ে বসেছিল, তখন মুখ-মিষ্টির পর কথা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। বাড়ির যে যত কথার মালা গেঁথে রেখেছিল, সে তা এক এক ক'রে গলায় পরিয়ে উপহার দিতে লাগল। কোন কথায় কি আর ফুলের ঘা ছিল? বরং কথা ফুল হলেও তার বৃন্তে ছিল জ্বালাময় কাঁটার অসহ্যকর যন্ত্রণা। শ্বাশুড়ীমাতার কথারও যেমন বাঁধুনি, তেমনি বিঁধুনি। আর কথা যত শোনে, তত রাগ ও ঘৃণা বাড়ে বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি।

সুন্দরী হাসীনা এতক্ষণ কাঁদছিল। অতঃপর সে যখন বলতে শুরু করল, তখন কী আর তার সমব্যথার সাথী না হয়ে রেহাই আছে?

অনেক পুরুষ আছে যারা ভুল ক'রে কোন মহিলার চেহারাকে

বিবাহ করে, কিন্তু সংসার করে তার সব কিছু নিয়ে। তার সুখ, তার দুঃখ, তার ছলনা, তার ভ্রষ্টতা, সব নিয়েই চলতে হয়। এমনই একজন পুরুষ মতী। অথচ যখন কোন বস্তুর বাহ্য চাকচিক্যে মানুষ মুগ্ধ হয়, তখন তার আভ্যন্তরিক দিকটাকে পরখ ক'রে দেখা উচিত।

হাসীনার রূপ আছে। চক্ষুভরা অশ্রুতেও সে বড় সুন্দরী দেখায়। আর যার রূপ আছে, তার রূপের ঝলকে মন আড়ালে পড়ে যায়। তখন রূপসীর মন কেউ দেখে না।

সৌন্দর্যের একটা আকর্ষণ আছে। সুন্দরীর কান্না দেখলে, সুন্দরীকে বিপদগ্রস্ত দেখলে মায়া জাগে বেশী। সুন্দর চেহারার প্রতি আশা জাগে বেশী। রূপসীকে উদ্ধারের জন্য পুরুষের মন উৎসাহী হয় বেশী, সে কারো প্রতিদ্বন্দ্বিনী হলে, তার সমর্থনে লোক জোটে বেশী।

পক্ষান্তরে যার স্ত্রী মোড়ল, তার জীবন বেকার। সে না পুরুষ, না স্ত্রী। সে কিছুই নয়। মতীও সেই রকম কিছু।

সাজানো-গুছানো কথায় সমর্থন করল তাদেরই গ্রামের এক যুবতী কাজলী, তারই অর্ধাঙ্গিনীর প্রাণপ্রিয়া সখী। আর কি বিশ্বাস না হয়ে যায়? বুঝল, এতদিন পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে চুপ থেকে সে ভুল করেছে। এবার সে আর চুপ থাকবে না। এবারে সে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ছিঃ! শ্বশুরবাড়িতে তার অপমান? অশিক্ষিত মা-বাপের কারণেই তার এ অপমান-বন্যা? এবার দেখব তাদেরকে।

রাত্রে বাড়ির ভিতরে যেন একটি স্বজন-সভা বসে গেল। অনেকে উপস্থিত ছিল সে সভায়। অতঃপর কেউ পূর্ব সভার আলোচিত বিষয় পঠনে, কেউ বর্তমান সভার আলোচ্য বিষয় নির্ধারণে, আবার কেউ

সমর্থন ও অনুমোদনে মনোযোগী হল। সকলেই যেন এক বাক্যে বলে উঠল, হাসীনাকে আর পাঠানো হবে না। অন্যথা পিতামাতার সাথে সমস্ত সংস্রব 'কাটাকাটি' করতে হবে। যেন তোমার মা-বাপের সাথে হাসীনার কোন প্রকার দেখা-সাক্ষাৎ না থাকে।

পাশ থেকে হাসীনাও বলল, 'ঘর-বাড়ি আলাদা না করলে আমি আর যাব না ওখানে।'

মতী নিশ্চয়তা দিয়ে বলল, 'তাই হবে।'

শয়ন-শয্যাতেও হাসীনা কাঁদতে ছাড়ল না। যেহেতু এখানেই স্বামী বেশী দুর্বল, এখানেই চাওয়া মতো পাওয়া যায়। এখানে স্ত্রীকে খোশ না করতে পারলে নিজে খোশ হওয়া যায় না।

মতী সব কথা মেনে নিল। স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসে এবং বাপ-মায়ের প্রতি অবিশ্বাসে তার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। তার স্ত্রীকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ঘরছাড়া করতে বাধ্য করা হয়েছে! আর যে কেউ এরূপ করলে মানা যেত, কিন্তু পিতামাতা হয়ে নিজের ছেলের নামে কলঙ্ক কীভাবে চাপাতে পারে? উপর দিকে থুথু ফেললে নিজের গায়ে পড়ে--- এ কথা তারা কি জানে না?

মতী কত সান্ত্বনা দিল শান্তিদায়িনীকে। কিন্তু সে উন্মাদিনী হয়েই থাকল। পরিশেষে সুব্যবস্থার পাকা অঙ্গীকার পেয়েই সেই গভীর যামিনী অভিমানী কামিনীর জয়জয়কারে অবসান ঘটল।

আনন্দোচ্ছ্বসিত দুঃসাহসী হাসীনা স্বামী ও পিতামাতার পরামর্শানুযায়ী প্রাতেই শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেল। সঙ্গে ছোট ভাই গাড়িচালক হিসাবে যাবে। পিতাও যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করল। তাতে জামাতা বাধা দিয়ে বলল, 'আপনার যাওয়ার প্রয়োজন হবে না। আমি ঠিক সামলে নেব।'

হাসীনার পিতা তাতেই ক্ষান্ত হল। মতী সতীর সাথে গাড়ি ক'রে বাড়ি ফিরে এল। সাথের সাথী হিসাবে কাজলী অবশ্যই ছিল।

এক আর একে মিলে দুই নয়। ভালবাসার অংকে এক আর একে এক। দু'টি মন মিলে এক হলেই তবে ভালবাসা হয়। কালোকে সাদা, নচেৎ সাদাকে কালো হতে হয়। দাম্পত্য জীবনে অনুরূপ না হলে ভালবাসা যে স্থানই পায় না। আর ভালবাসা ছাড়া কি দাম্পত্যে সুখ আছে? তাহলে ভালবাসা রক্ষার্থে মতী কেন হাসীনার স্বভাবধর্মে এক ধর্মাবলম্বী হবে না?

বাড়ি ফিরে গ্রামের মোড়ল-মাতব্বর ও স্বজনদেরকে আহবান করা হল। ঝগড়া না বাড়িয়ে মতী চুপচাপ সব কিছু পৃথক ক'রে নেওয়ার প্রস্তাব রাখল। যে সকল বাড়ি ও জমি তার নামে আছে, তা তার অধিকারে থাকবে। বড় বাড়িতে মতী ও বউ থাকবে। গোয়াল-বাড়িতে মা-বাপ বাস করবে। গ্রাম্য কমিটি এমন অন্যায় বিচার মানতে রাজী হল না। কিন্তু আইন-ওয়ালাদের কাছে সেটাই পাকাপোক্ত হল যে, যার নামে যেটা আছে, আপাততঃ সেটা তার।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য কাঁদতে লাগল। কিন্তু কে কী করবে? এ বিষয়ে কেউ নাক গলাতেও চায় না। কারণ, মা-বেটার কলহ। আজ আছে, কাল নেই। এক সময় মায়ে-পুতে এক হবে, বাইরের কথা থেকে যাবে। 'আমে-দুধে এক হবে, আর আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যাবে।' অতএব খামোখা কেউ নিজের মান খোয়াতে যাবে কেন?

অবশেষে দেখা গেল, কর্তাকর্ত্রীর কেবল বিঘে দুই জমি আর ঐ গোয়াল বাড়িটা, যেখানে গরু-ছাগল বাঁধা থাকে। তাদের মস্তকে যেন

বজ্রাঘাত হল। এবার নেহাত পথের ভিখারী হওয়া ছাড়া উপায় কী?

গ্রামের অনেকে এবং স্বজনদের মধ্যে অনেকেই মতী ও সতীকে বুঝাবার বহু চেষ্টা করল। কিন্তু কারো মতিভ্রম দূর করা গেল না।

নিরাশ হয়ে পিতা মুখ খুলল। তাতে মতীও গর্জন ক'রে উঠল। কৃতঘ্নের মতো পিতাকে সে যা-তাই বলতে লাগল। পিতা বলল, 'তোকে জন্ম দিয়ে আমরা কোন উপকার করিনি?'

---কামনার বশে সব নারী-পুরুষই সন্তানের জন্ম দেয়।

---তা না হয় মেনেই নিলাম যে, কামনার বশে আমরা মিলিত হয়ে তোর মতো নেমকহারাম সন্তানের জন্ম দিয়েছিলাম। কিন্তু জন্মের পর তোকে মানুষ করতে, তোর আরামের জন্য নিজেদের আরাম হারাম করতে, তোর চোখে ঘুম দেখতে নিজেদের চোখে ঘুম উড়িয়ে দিতে, তোকে খাওয়াতে-পরাতে, তোর পেশাব-পায়খানা সাফ করতে কত রকমের কষ্ট বরণ করতে তো আমাদের কোন কামনা ছিল না।

এ সংসারে কুকুর লালন করলে, সে কৃতজ্ঞ হয়, গাধা পুষলে সেও বাধ্য হয়, বিড়ালকে খাবার দিলে সেও বশীভূত হয়। বরং অনেক মানুষের কাছে হিংস্র প্রাণী সিংহ ও বাঘের বাচ্চা পর্যন্ত পোষ মেনে যায়। পক্ষান্তরে মানুষ তার নিজের বাচ্চার জন্য কত কী করে, নিজের প্রাণ দিয়ে তার প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু সেই বাচ্চা বড় হলে তাকে অস্বীকার করে! শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মাঝে এ নেমকহারামি কি শোভনীয়?

'যে সন্তান অকৃতজ্ঞ, তার দাঁতের ধার সাপের চেয়েও বেশী।' এ সকল আপ্তবাক্য স্মরণ করিয়েও কোন ফল হল না। পরশত্রুকে সহ্য করা যতটা সহজ, ঘরশত্রুকে সহ্য করা ততটা সহজ নয়। কিন্তু পরের উৎসাহে আজ ঘর পর হয়েছে, এখন ঘরে-ঘরে ভালবাসা আবার কে

ফিরিয়ে আনবে?

(৬)

এ বাড়ির সম্রাজ্ঞী এখন হাসীনা। একান্ত দুঃসাহসিনী না হলে কি পরের বুকে পা দিয়ে এইভাবে কেউ সংসার করতে পারে? তাও আবার আনন্দের সাথে, গর্বের সাথে। গ্রামের লোকে কে কী বলছে, তাতে কান ক'রে তার লাভ কী? পরের সমালোচনা করা ও পরের সুখ দেখে হিংসা করা তো গেঁয়ো লোকদের স্বভাব। এখন হাসীনার মন বলে, 'একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাঠি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।' 'একলা থাকি একলা খাই, ধরতে ছুঁতে কেউ নাই।' এখন তার সুখের পথের কাঁটা দূর হয়েছে। এই সুখ নেওয়ার জন্যই তো সে বাপের বাড়িতে থাকে না। স্বেচ্ছাচারিতার আচরণে তার আর কোন বাধা নেই, কোন শাসনের বেড়া নেই। জীবনটাকে মনের মতো আনন্দ দিয়ে অতিবাহিত করার জন্য সে বড় উদগ্রীব। এখন তার সুখ-স্বপ্নের গভীর রজনী। স্বামী বাড়িতে না থাকলে সখী কাজলীই তার চোখের কাজল হয়ে থাকে। সে সব সময় এখানে সখীর শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে ও ভোজনেও সাথী। কত সুখ তাদের! একজনের বাগান খালি ক'রে নিজের বাগান সাজিয়ে কত আনন্দ তাদের!

একদিন কাজলী আহসানকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ ক'রে যেন হাসতে হাসতে বলল, 'সখী! আহসানের দাদা মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। মাথায় পানি ঢালার পর তার জ্ঞান ফিরছে। আজ আবার গোয়াল-বাড়ির মাচান থেকে পড়ে গেছে। তাতে তার মাথা ফুটে অনেক রক্ত ঝরেছে। এখন দেখলাম ডাক্তার এল।'

হাসীনা মুচকি হেসে ঠোঁট বাঁকা ক'রে বলল, 'বেশ হয়েছে, আরো হবে। ওদের খবর কেন আনছ বল তো?'

'শুনলাম, তাই বললাম।'---এ কথা বলেই কাজলী বের হয়ে গেল। কর্তার এহেন খবর শুনে তার নারী মনে ব্যথা লেগেছিল। তাই সে আহসানকে কোলে নিয়েই হাসীনার অজান্তে কর্তার সাথে দেখা করতে গেল। সেখানে গিয়ে দেখল, ডাক্তার বাবু ব্যান্ডেজ ক'রে ওষুধ দিয়ে ফিরে গেছেন। বৃদ্ধ বিছানায় শায়িত, তবে জ্ঞান আছে। বৃদ্ধা শিয়রে বসে হাত-পাখা হিলাচ্ছে। কাজলী অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কী ক'রে পড়ল চাচী!'

কর্ত্রী উপর দিকে মুখ তুলে বলল, 'খড় পাড়তে গিয়ে পা পিছলে গেছে।'

বৃদ্ধ তখন কোন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল। তারই মাঝে সে তার আদরের পৌত্রকে দেখতে পেল কাজলীর কোলে। অন্তরের স্নেহবন্যা আবেগে উপচে পড়ে যেন তার দেহ ভাসিয়ে তুলল। বেদনাহত কণ্ঠে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওটা কে? আহসান নয়? এস আব্বু! একবার বুকে এস। একবার তোমাকে দেখে নিই। একবার চুমু খাই। একবার 'দাদা' বল সোনা!

আহসান বলল, 'দাদা।' তারপর সে কোল থেকে নেমে দাদার বুকে যেতেও চাইল। কিন্তু কাজলী আহসানকে ছাড়তে ইতস্ততঃ করতে লাগল। কী জানি, যদি হাসীনা এ কথা জানতে পারে। সে এক উভয় সংকটে আপতিত হল। এখন সে কার কথা রাখবে; কর্তার না সখীর?

বৃদ্ধা বলল, 'ওকে নিয়ে এসেই তুই ভুল করেছিস।'

বৃদ্ধ হাত গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'না সোনা! তুমি তো আর আসবে না। তুমি যে পর হয়ে গেছ। আমি যে তোমাদের কেউ নই। আমরা যে তোমাদের দুশমন বাবা! আমরা যে----'

বৃদ্ধা তার মুখে হাত রেখে বলল, 'চুপ কর। বেশী বকলে আবার অন্য রকম হয়ে যাবে। মাথায় ঘা আছে।'

তারপর কাজলীর উদ্দেশ্যে বলল, 'যা মা! ওকে ঘর নিয়ে যা। নচেৎ এক্ষনি ও হার্টফেল ক'রে বসবে।

কাজলী চলে গেলে বৃদ্ধ-বদ্ধা কেঁদে উঠল। পূর্ব জীবনের কথা যত মনে পড়ে, তত তাদের হৃদয়ে মোচড় দিয়ে ওঠে। সেই মতীর গর্ভ থেকে নিয়ে আজ এই শিক্ষাগর্ব পর্যন্ত তাদের বিনিময় কী? কত টাকা খরচ ক'রে আজ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে দিয়েছে, এই দিন দেখার জন্য? কাদা-গোবরের ছিটা লাগতে না দিয়ে পাকা বাড়ি বানিয়ে বিলাস করতে সাহায্য করেছে, এই গোয়াল-বাড়িতে বাস করার জন্য? এত কিছু অধিকারী হয়েও, আজ তারা যেন পথের ভিখারী। একান্ত আপন হওয়া সত্ত্বেও, সে যেন কেউ নয়, সে আজ পর।

'আজ তুমি দেখেও দেখ না
সব কথা শুনিতে না পাও।
কাছে আস আশা ক'রে আছি সারা দিন ধরে,
আনমনে পাশ দিয়ে তুমি চলে যাও।।'
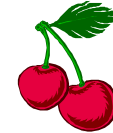
(৭)

আচ্ছা কাজলী! তোর ব্যাপারটা কী শুনি? তোকে বারবার আসতে বলা হল, তবুও তোর দেখা নেই। আজকাল পার্টি ভাল পেয়েছিস বুঝি? তাহলে তো আমাদের গায়ে গন্ধ ছুটবেই।

---ছিঃ ছিঃ! ওসব কথা কী বলছ? উল্টাপাল্টা বললে পালাব।

---আটক করব, দরজা বন্ধ ক'রে দেব!

---আসল কথা বল।

---পাশে বস্ না একটু, তারপর বলি।

---আহা! আমি যেন তোমার বিয়ে করা বউ।

---বা-রে! বউ হতে মন যায় না বুঝি? আগে আমার বিয়েটা সেট ক'রে দে, তারপর তোর বিয়ে লাগিয়ে দেব।

---বিয়ে না করেই ভাল আছি বাবা! বেশ স্বাধীন আছি।

---হাঃ হাঃ! 'লোহা জব্দ কামার-বাড়ি, মেয়ে জব্দ শ্বশুর-বাড়ি।' আরো বলা হয়, 'হলুদ জব্দ শিলে, চোর জব্দ কিলে, দুষ্ট মেয়ে জব্দ হয় শ্বশুর বাড়ি গেলে।'

---তুমিও বিয়ে কর, তারপর দেখবে কে কাকে জব্দ করে। জানো তো, বিয়ে মানে কাঁধে জোঁয়াল?

'জানি।' বলে মন্টু একটি সিগারেট ধরিয়ে পুনরায় বলল, 'হাঁ রে! তাকে কই আনলি না তো?

---তুমি যখন বলেছ, তখন সে মায়ের ঘরে ছিল। এখন অবশ্য এসেছে। তবে ওদের বাড়িতে বড় ঝগড়া-ঝামেলা চলছে। বেশ সুবিধে

হবে না বুঝলে?

---তাহলে কবে আনবি?

---দু'দিন সবুর কর। আমি তাকে বলে দেখব।

---দু'দিন সবুর করতে হবে? কেন?

---পরের বাড়ির বউ তো। তাকে দেখতে হলে সময় বুঝে একটু লুকিয়ে-ছুপিয়ে দেখতে হবে। এত মাতামাতি করলে হবে?

---দেখতে বড় সুন্দরী, নয় রে?

---দারুন। বলবে এখন ছেলের মা হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার রূপের ছটা যেন দ্বিগুণ হয়ে ঘর আলো করে। মাইরি! তোমার সাথে হলে এমন মানা তো না! তুমি তখন কেন করনি বল তো?

---যৌতুক নিয়ে গোলমাল। আর আমি তো তার এতটা সৌন্দর্যের কথা জানতাম না। কাল ওকে একবার এ বাড়িতে নিয়ে আয় না।

---চেষ্টা ক'রে দেখব।

দূতী কাজলী বড় চিন্তা নিয়ে বাড়ি ফিরল। কীভাবে সে সখীকে পটিয়ে একবার মন্টুর সাথে সাক্ষাৎ করাতে পারবে, তারই ফন্দি-ফিকির করতে লাগল। হঠাৎ ক'রে সখীকে এ কথা বলা যায় কীভাবে? যদি উত্তর নেতিবাচক দেয়, তাহলে সে আর কোনদিন তাকে এ কথা বলতে পারবে না।

দু'দিন পর সে একটা খবর শুনল, তাতে তার অন্বেষিত সুযোগ হাতে এল। ডাঙ্গায় চার রাত্রি ব্যাপী অস্থায়ী সিনেমা আসছে। এতে যদি হাসীনাকে নিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে কিস্তিমাৎ। আর সে তো যাবেই, কোন সন্দেহ নেই।

সখীর বাড়িতে এসে কথায় কথায় সে সিনেমায় যাওয়ার প্রস্তাবটা

রাখতে গিয়ে হঠাৎ এসে উঠল। সখী বলল, 'কী সই? হঠাৎ পাগলীর মতো হেসে উঠলে যে?'

---স্বপ্ন দেখলাম, সখা আসছে।

হাসীনাও হেসে উঠল। তারপর বলল, 'কী? দিনের বেলায় জেগে জেগে স্বপ্ন?'

কাজলী আরো উচ্চৈস্বরে হেসে বলল, 'দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখা আমার অভ্যাস আছে।'

হাসীনা এবার হাসি বন্ধ ক'রে বলল, 'তাহলে তুমি ভুল স্বপ্ন দেখেছ। কারণ সে এ মাসে আসবেই না।'

---তাই নাকি?

---সত্যি বলছি।

কাজলীর সুযোগ আরো সহজ হল। পুনরায় মুচকি হেসে বলল, 'একটা মজার খবর আছে!'

---কী খবর?

---ডাঙ্গায় সিনেমা আসছে। আগামী রবিবার থেকে চার রাত্রি চলবে। দেখতে যাবে?

---সত্যি?

---একদম সত্যি। কাছেই তো। রাতের অন্ধকারে যাব, আর অন্ধকারেই ফিরে আসব। কেমন?

---কিন্তু কেউ দেখে ফেললে কী হবে?

---পাত্তাই দেব না। তুমি পর্দা-বিবি সেজে ঘোমটা টেনে নেবে।

---বেশ।

কাজলী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল। সখীর গায়ে গা এলিয়ে

দিয়ে বলতে লাগল, 'লা-লা-লা----।'

(৮)

রবিবার বিকালে হাসীনার বাড়িতে দুই সখীর আনন্দ-বন্যা যেন স্রোতঃশীল হয়ে বাইরে বয়ে যেতে লাগল।

অপর দিকে বৃদ্ধকে নিয়ে বৃদ্ধার আরও পাঁচজন আত্মীয়র কাতর-করুণ স্বর যেন পাষাণ কাঁদিয়ে তুলল। কী জানি বৃদ্ধের অসুখ সেদিন কেন এত বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে উঠেছিল। ঔষধে অসুখ সাড়ে, কিন্তু ঔষধই মুখে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভিতরে এক তিল পরিমাণও পৌঁছে না। উপস্থিত সকলেই বলতে লাগল, 'হয়তো কর্তার আজকের রাত্রিও গত হবে না। সে আজই বিদায় নেবে।'

কর্ত্রীর দুঃখের সীমা নেই। পুত্র তো সবে ধন নীলমণি হওয়া সত্ত্বেও কেউ নয়। একমাত্র অবলম্বন হওয়া সত্ত্বেও ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এখন আল্লাহর পর আশ্রয়দাতা যে, সে-ও চির-বিদায় নিতে চলেছে। তাহলে তার উপায় কী? কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সে? কীভাবে তার কালাতিপাত হবে? উত্তপ্ত মরুভূমির মাঝে দু'টি গাছের মধ্যে দু'টিই যদি মরু-ঝটিকায় ভেঙ্গে যায়, তাহলে কার ছায়াতলে সে আশ্রয় নেবে?

বধূর এ সকল কথা জানতে-বুঝতে অবশিষ্ট ছিল না। তবুও কী জানি, তার রক্ত-চামড়ার গড়া কোমল দেহের ভিতরে পাথর-নির্মিত হৃদয় কেন? তার চেহারা এত সুন্দর, কিন্তু মন এত কুৎসিত কেন?

কোন রকম রাত্রি অতিবাহিত হল। বধূকে বাইরে যেতে হলে গোয়াল-বাড়ির সামনে বেয়ে পার হতে হয়। ভিতর দিকে দৃষ্টি ফিরালে শয্যাশায়ী কর্তাকে যে কেউ দেখতে পাবে। কর্ত্রী দেখল, বউ পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ দিকে তাকায় না সে। এ চরম বিপদ মুহূর্তেও তার

মনের গতির পরিবর্তন ঘটে না। এ কথা ভেবে নিজেকে নেহাতই একাকিনী মনে ক'রে তার অন্তর কেঁপে উঠল। যারাই কর্তাকে দেখতে আসে, তারাই তাকে ধিক্কার দেয়। তার উদ্ধত আচরণ দেখে স্তম্ভিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়। ঘর পর হলেও সময়ে সে পর আবার ঘর হয়ে যায়। আপদে-বিপদে মানবিকতার খাতিরে অথবা চক্ষুলজ্জার কারণেও অনেকে কলহের কথা বিস্মৃত হয়ে পুনরায় আপন হয়ে যায়। কিন্তু হাসীনা কোন্ মানুষ? কোন্ নারী সে? তার কি কোন হৃদয়ই নেই?

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল, তখন হাসীনা বিলাস-ব্যসনে মত্ত। রূপসীকে আরো রূপের রানী ক'রে তুলল প্রাণের সখী কাজলী। প্রসাধন-দ্রব্যে যেন গৃহশুদ্ধ সুগন্ধে মেতে উঠল। আজ তারা সিনেমায় যাবে। তাই আনন্দ। বহু দিন থেকে হাসীনা বাড়িতে টিভি আনার কথা বলে আসছিল। কিন্তু কেবল শ্বশুরের জন্য তা পারেনি। আজ সে প্রেম-কাহিনী দেখবে। মিঠা-মিঠা হাস্য ক'রে কাজলী বলল, 'সখী! আজ যেন তোমার প্রথম বাসর। তুমি যেন তিন দিনের কনে!'

---আজ বড় শুভদিন মনে হয় সখী! হৃদিজল যেন আজ নতুন ক'রে উথ্‌লে উথ্‌লে উঠছে। মনের ভিতরে যেন প্রেমের বাগিচায় নব বসন্তের কুসুমরাজি যৌবন-সমীরণে আন্দোলিত হচ্ছে।

কাজলী বলতে লাগল,

আহা সখী মানায় ভালো
আঁধার ঘরে রূপের আলো,
কে বলে সই বাতি জ্বালো?
বধূর মুখে মধুর বাণী
শুনলে হয় মনের রানী
কে বলে ফের বাঁশি আনি?

হাসীনা বলল,

চেয়ে দেখ আকাশ পানে
মধুমাখা ঐ প্রেমের গানে,
জীবন দানে মৃত প্রাণে।

সুগন্ধ ও আনন্দ-মুখরিত কক্ষে হাসীনা যেন নেচে উঠল। প্রেমকামী হৃদয়ে যেন পুলক ধরে গেল। চিত্তবিজয়ী সখী কাজলীর বস্ত্রাঞ্চল ধরে বলতে লাগল,

বাহারে সখী জীবন ধরি'
সখীর হৃদয়ে কাকলি করি'
এসেছ, আহা মরি মরি!
হর্ষে-বিষাদে সদা একই,
এক শয্যায় এক স্বপ্ন দেখি
এক বৃন্তে দু'টি ফুল মোরা
এক মঞ্চে দুই নর্তকী।

---বাঃ সখী! চমৎকার! সত্যি ভাই! শিরায় শিরায় রক্তে যেন বিজলী ছুটছে! না, এবারে চল। সময় তো হয়ে এল।

খুশীর পুলকে চলরে সই
এবার আমরা রওনা হই,
থেকে থেকে ডাকে মোদের
সন্ধ্যাকাশের তারা ওই।

বের হওয়ার মুহূর্তে কাজলী যখন সখীর আহলাদ ভরা মুখশশীর দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন সে দেখতে পেল, তার চোখে-মুখে যেন বিরক্তির ছাপ। কারণ জানার জন্য ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কী সখী!

হঠাৎ মুখ ভারি করলে কেন?'

সখী ওষ্ঠাধরে হাসির রেখা টেনে উত্তর দিল, 'আহসানকে নিয়ে বড় জ্বালা! আজকের দিনে যদি না থাকত।'

কাজলী বলল, 'ছিঃ! ছেলের মায়ের ঐ কথা সাজে? আমি কোলে নিয়ে থাকব। আর তুমি না হয় খালি হাতে থাকবে। তাছাড়া রাখবেই বা কোথায়?'

পুনরায় রহস্য ছলে বলল, 'বুড়িকে দিয়ে আসব?'

কী কথা মনে পড়লে হাসীনার মনের গতি হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে গেল। ধিক্কার দিয়ে সখীকে বলল, 'ছিঃ! তওবা কর, তওবা কর।'

---তোবা, তোবা, তোবা!

হাসীনা আহসানকে কোলে দিয়ে আবার গান ধরল,

'গোপন প্রেমের মোহন বাঁশি এখন বাজাব,
আমি কোলের ছেলে জলে ফেলে যৌবন সাজাব।
আর সরু ক'রে সিঁথি কেটে চ্যাংড়া নাচাব।'

বলেই হো হো ক'রে দুজনেই হাসতে লাগল। তারপর তারা অতি সন্তর্পণে গন্তব্য পথের দিকে পা বাড়াল। কত লোক পদব্রজে, সাইকেলে চলেছে সেই পথে। কত গাড়ি গাড়ি নারী চলেছে সেই অবাধ্য পথে। সেই গাড়ির ঘেরাটোপে পর্দা আছে, মহিলার দেহে বোরকা আছে, কিন্তু যাচ্ছে সিনেমা দেখতে। এ আজব স্ববিরোধিতা।

অন্ধকার পথে হাঁটার পথে কেউ হোঁচট খেয়ে পড়ছে, কেউ বা কারো সাথে ধাক্কা খাচ্ছে, তাতে কত মজা লাগছে। সেই পথে দুই সখী মনভরা খুশী নিয়ে চলেছে মনের গোপন বেদনা দূর করতে। কী তাদের সুর তাদের কণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনিতে! ধনীর ধনিকন্যা ধনীর গৃহবধূ চলেছে

আজ অভ্যাসগত বিলাস-সাধ মিটাতে অস্থায়ী প্রেক্ষাগৃহে।

প্রেক্ষাগৃহের নিকটবর্তী জায়গায় যেখানে তীব্র আলো চোখে-মুখে ধাঁধা লাগাচ্ছিল, ঠিক সেখানে রাস্তার ধারে বিশাল দীঘির পাড়ে বটগাছের আড়াল হতে কে ডাক দিল, 'কাজলী!'

দুই সখীতে চমৎকৃতা হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। পরক্ষণে কাজলী মৃদু হেসে উঠল। হাসীনা রহস্য বুঝতে না পেরে অবাক নয়নে শব্দ আসার দিকে চেয়ে রইল। কে ডাকছে? কেন ডাকছে? হাসীনা সোৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল সখীর মুখের দিকে। কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করল, 'কে ডাকছে?'

কাজলী মন্টুকে সাক্ষাতের কথা দিয়ে রেখেছিল। সে তা বুঝেও উত্তরে উপহাস ছলে বলল, 'সন্ধ্যাতারা।'

---বেশ তো রহস্য! কে বটে বল না!

---সেই একদিন রাত্রে আমাদের বাড়ি যাওয়ার পথে তোমাকে কার কথা বলেছিলাম মনে আছে?

হাসীনা এবারে বুঝতে পারল, তার সাথে সর্বাগ্রে যে যুবকের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল, সেই যুবক। মনে হল তাকে দেখার যে ইচ্ছা সে পোষণ ক'রে রেখেছিল, তাই হয়তো আজ পূরণ করবে। ইতিমধ্যে যুবক কাছাকাছি হয়ে গেল। কাজলী সতর্কতার সাথে বলল, 'রাস্তা থেকে সরে দীঘির নিচে চল।'

ক্ষীণ আলোতেই মন্টু হাসীনার দিকে তাকিয়ে তার রূপদর্শন করতে লাগল। হাসীনা লজ্জায় যেন লজ্জাবতী লতার মতো ঝিমিয়ে গেল। কিন্তু ক্ষণকাল বাক্য-বিনিময় করার পর সে লতার বন্ধ পাতাগুলি পুনরায় খাড়া হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে তার লজ্জা ও

সংকোচের অবসান ঘটল। কারণ, তার মনেও সেই আশা ছিল, যে আশা ছিল মন্টুর মনে। একে অন্যের রূপ দেখে মুগ্ধ হল। মন্টু বড় পস্তাতে লাগল। আফসোস ক'রে বলল, 'কেন তোমাকে বিয়ে করিনি? আমার পোড়া কপাল!'

হাসীনা বলল, 'ভাগ্যই তো মানুষকে মনের সব কিছু পেতে দেয় না। সব চাওয়া কি পাওয়া যায়?'

মন্টু আহসানকে কোলে নিয়ে আদর করতে লাগল। কিছু পরে হাসীনার কোলে তুলে দিয়ে তড়িঘড়ি ছুটল বাজারের দিকে। যেতে যেতে বলল, 'এখানে তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসছি।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছু পরে সঙ্গে কিছু মিষ্টি ও আহসানের জন্য খেলনা নিয়ে মন্টু ফিরে এল। মিষ্টি খেতে বলে পুনরায় সত্বর চলে গেল সিনেমার টিকিট কাটতে।

দূতীর মনে ছিল সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেওয়ার আনন্দ। হাসীনার মনে এল অকস্মাৎ অভিনব প্রেমের জোয়ার। আর মন্টুর মনে ছিল হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকা ফিরে পাওয়ার আনন্দ।

(৯)

এশার নামায পড়ে কর্ত্রী রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় মনোযোগ দিয়েছিল। শিয়রে কত রকমের ঔষধ সাজানো রয়েছে। তার পার্শ্বেই রয়েছে কাঁচের গ্লাসে শরবত, কাঁসার বাটিপূর্ণ সাদা পানি, ডিম সিদ্ধ, আত্মীয়দের আনা ফলমূল ইত্যাদি। কিন্তু কর্ত্রীর চেষ্টা বিফল। এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে এটা খাওয়াতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও কর্তা খেতে

চাচ্ছে না অথবা পারছে না। এরপর কর্তব্য ঠিক করতে না পেরে কপালে হাত রেখে সে কর্তার শিয়রে বসে রইল।

বৃদ্ধের জ্ঞান পরিপূর্ণ বিদ্যমান। কিন্তু মুখ খুলে কথা বলতে পারে না। কী জানি, তার একমাত্র কুপুত্র তাকে কোন রোগের সাথী বানালো। বৃদ্ধ মনে মনে চিন্তা করছিল, মতীকে কীভাবে শৈশব থেকে কোলে-পিঠে মানুষ করেছিল। কীভাবে কত কষ্ট ক'রে জমি-জায়গা কিনে তার নামে রেজিষ্ট্রি করেছে। তার আরামের জন্য কত রাত জেগেছে। কত কষ্ট ক'রে অর্থ বাঁচিয়ে স্কুল-কলেজে ব্যয় ক'রে তাকে এত বড় শিক্ষিত করেছে। নিজেরা ভালটা না খেয়ে ছেলের জন্য অবশিষ্ট রেখে সে বাড়িতে এলে তাকে তা খাইয়েছে। এক সাথে খেতে বসে ভাল খাবারটাই তার পাতে তুলে দিয়েছে। এ সবের কোন প্রতিদান কী তারা পেয়েছে? তাদের যথাকর্তব্য পালন করার বিনিময় কি এই ঘৃণা, অবজ্ঞা, অবহেলা? তার পদোন্নতির বদলা কি এই পদাঘাত?

চিন্তার পথে এ পর্যায়ে পৌঁছে বৃদ্ধ যেন আর সহ্য করতে পারছিল না। জোয়ার-ভাটার মতো তার মন-প্রাণের আকর্ষণ-বিকর্ষণ তাকে নিষ্পিষ্ট ক'রে তুলছিল। শ্রাবণের বাদলের মতো তার করুণ অক্ষিদ্বয় হতে দরবিগলিত অশ্রুধারা ঝরতে লাগল। এত যন্ত্রণা কি সহ্য হয়? এখন ব্যাধির চেয়ে আধিই তার বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধৈর্য তার সীমা লংঘন করেছে। সুতরাং পার্শ্ব ত্যাগ ক'রে বৃদ্ধ বিক্ষত কপালে করাঘাত করল। কিন্তু তাতে কি শান্তি আছে? শান্তির মলম পেল মরণের মাঝে। যে মানুষ ঈমানদার ও নামাযী, যে জানে আত্মহত্যা মহাপাপ, সে মানুষ শারীরিক ও মানসিক রোগের চাপে মরণকেই শান্তির পথ বলে বেছে নিল। যাদের জন্য জীবন ধারণ, তারাই ফিরে চায় না। তবে এ জীবন

রেখে লাভ কী?

রাত্রি অনেক হয়েছে। কর্ত্রী তখন তন্দ্রায় ঢুলছিল। রোগীর সেবায় সে তো তেমন নিদ্রা-আহারের সুযোগ পায় না। কর্তা নিরাশ হয়ে মরণের পথ খুঁজতে লাগল। কপালের যন্ত্রণায় ব্যান্ডেজে হাত ফিরিয়ে এক স্থানে আঙ্গুল প্রবিষ্ট ক'রে পটি খুলে ফেলল। দুঃখে, ঘৃণায়, ধিক্কারে, যন্ত্রণায় মরিয়া হয়ে সে ক্ষতে তর্জনী প্রবিষ্ট করল!

তারপর? তারপর সেখান হতে ফিক ধরে রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল। অতিরিক্ত যন্ত্রণাকাতর হয়ে বৃদ্ধ 'আল্লা---হ' বলে চিৎকার ক'রে উঠল। সেই চিৎকারে বৃদ্ধার তন্দ্রা ছুটে গেল। সচকিত হয়ে চেয়ে দেখতে পেল, কর্তার কপাল থেকে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। হতভম্ভ হয়ে কী করবে তা স্থির করতে পারল না। পরক্ষণে নিজের পরিধেয় শাড়ির আঁচল দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরল। কিন্তু ততক্ষণে বৃদ্ধ জ্ঞানশূন্য। এরপর কী করবে সে?

সে-ও চিৎকার ক'রে বলে উঠল, 'ওগো! কে কোথায় আছ, একবার ছুটে এস গো। হায় হায় আমার সর্বনাশ হল গো!'

কিন্তু চিৎকার ক'রে ডেকে-হেঁকে সে ব্যর্থ হল। এক বাড়ির লোক বউ ছাড়া হয়তো আর কেউ শুনতেও পাবে না সে ডাক। রক্তের ফোয়ারা তখনও বন্ধ না হওয়ার ফলে ছেড়ে উঠে গিয়ে কারো দরজায় ধাক্কা দিয়ে জাগাতেও পারছে না সে। অবশেষে একটি উপায় খুঁজে পেল সে। পাশেই কর্তার গামছা নিয়ে কাঁপা হাতে কোন রকম মাথায় পেঁচিয়ে টিপে বেঁধে দিল। তাতে রক্ত থেমেছে দেখে উঠে অতি বেগে পাশের বাড়ির দরজায় সজোরে ধাক্কা দিল। কিন্তু কই? কেউ সাড়া পর্যন্ত দিল না। সাড়া দেবেই বা কী ক'রে? প্রায় বাড়িই তো সে রাতে ফাঁকা! চিত্ত-বিনোদনের জন্য তারা

যে ডাঙ্গায় গেছে সিনেমা দেখতে। সুতরাং অবস্থা দেখতে ত্রস্তপদে আবার ছুটে এল বৃদ্ধের নিকট। ভাবল, এবার হয়তো সে উপায়হারা। এক্ষণি হয়তো কর্তার প্রাণ-পাখি দেহের খাঁচা ছেড়ে উড়ে যাবে! পেটটা তখনও দুলছে, আর তার মানে শ্বাসক্রিয়া চলমান আছে। মাথার জড়ানো গামছাটা রক্তে ভিজে গেছে। বৃদ্ধা এবার চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। কিন্তু মাতম ক'রে কাঁদতে হয় না জ্ঞান থাকায় কোন কথা বলল না। কর্তার মাথায় হাত রেখে বসে 'মতীর আব্বা, মতীর আব্বা' বলে ডাকতে লাগল। কিন্তু কর্তা তখনও সংজ্ঞাহীন।

পরক্ষণে মনে হল, বিপদে শত্রু আপন হয়। তবে কি পুত্রবধূকে ডাক দিলে একবার আসবে না? সে কি ডাক ও কান্না শুনতে পায়নি? হয়তো বা তাই। অতএব বেদনায় টন্‌টন্ ক'রে ওঠা মন নিয়ে ঘৃণা ভুলে কান্নাহত কণ্ঠে বধূকে ডাক দিল, 'বউমা হাসীনা!'

হাসীনার সাড়া নেই। দরজায় ধাক্কা দিল। তাতেও তার শব্দ নেই। হায়রে কপাল! কোথায় বউমা হাসীনা? হাসীনা তো হাসতেই গেছে। বৃদ্ধা কিন্তু তার অনুপস্থিতির কথা অনুমান করতে পারল না। সে ভাবল, হয়তো আঁট ক'রেই সে সাড়া দিচ্ছে না। বৃদ্ধা তবুও হাল ছাড়ল না। বলতে লাগল, 'বউমা! আর আঁট নয় মা! এ বিপদে তুই আমাকে ক্ষমা ক'রে উদ্ধার কর মা! আল্লাহ তোর মঙ্গল করবে।'

বৃদ্ধা তাদের বড় বাড়ির সদর দরজার সামনে মাথায় হাত রেখে কাঁদতে লাগল। 'হে আল্লাহ! রক্ষা কর মওলা' বলতে বলতে উঠে নিরাশ মনে ফিরে এল রক্তাক্ত দেহের কাছে।

বৃদ্ধার এই করুণ শব্দটি দূরের বাড়ির গৃহিণী রশীদা শুনতে পেল। সে একটি হ্যারিকেন হাতে ছুটে এসে উপস্থিত হল বৃদ্ধার কাছে। সে

তার নিকট যা শুনল, তাতে সে-ও কর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে গেল। বধূকে চেতনাপ্রাপ্তা করার জন্য সেও দরজায় গিয়ে বহু ডাকাহাঁকা করল। কিন্তু বধূর সাড়াশব্দ কিছুই পেল না। পরক্ষণে দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে উপর দিকে লক্ষ্য ক'রে দেখল দরজা তালাবদ্ধ। বড় বিস্মিতা হয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে সে কর্ত্রীকে বলল, 'বউমা তো ঘরে নেই। ঐ দেখ দরজায় তালা মারা। সে মনে হয় সিনেমায় গেছে। তবে এত হাঁকলে কে সাড়া দেবে?'

হাসীনাকে শত ধিক্কার দিয়ে কর্ত্রীর হাত ধরে রোগাক্রান্ত অপমরণাপন্ন-প্রায় বৃদ্ধের নিকট গিয়ে বসল। তখন তার রক্ত বন্ধ হয়েছে, কিন্তু জ্ঞান ফেরেনি। এরই মধ্যে কানজাগা ঘুমে কাঁদাকাটি শুনে আরো দু'জন প্রতিবেশিনী এসে উপস্থিত হল। সকলেই হাসীনাকে কত গালিমন্দ করতে লাগল।

করবেই তো। সে কি শ্বশুরের অসুখ অবস্থার কথা জানত না? মতীর নিকটে অসুখের খবর দিয়ে লোক পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সে তা মিথ্যা মনে করেছে। কারণ, গতকাল স্ত্রীর পত্রে সংবাদ পেয়েছে যে, বাড়ির সকলে কুশলে আছে। তাছাড়া তার আশঙ্কা ছিল এই যে, হয়তো গেলে পুনরায় কোন বিচার সভায় তাকে অপমানিত হতে হবে।

সকলেই সেসব প্রতিবেদন শুনে বেদনাহত হয়ে বলতে লাগল, 'বাহারে হৃদয়হীন পুত্র! যার অনুগ্রহ ও অন্নে প্রতিপালিত, আজ তাকেই দূর ভাব? ভেড়ুয়া মরদ স্ত্রীকেই বড় মনে কর? সবুর কর, তুমি যাকে মাথায় তুলে নাচছ, সেই একদিন তোমার মাথায় লাথি মারবে।'

মায়ের মন ছেলের প্রতি বড় স্নেহশীল। সে বলে উঠল, 'ও কথা বলিস্ না বোন! আল্লাহ তার মঙ্গল করুক।'

রশীদা বলল, 'রবুর বাপ বলছে, ও একদিন মতীকে বুঝিয়ে বলতে গিয়ে মা-বাপের বদ্দুআ লেগে যায় বলে ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু তার জবাবে মতী নাকি বলেছে, 'শকুনির বদ্দুআতে ভাগাড়ে গরু পড়ে না।'

কর্ত্রী বলল, 'বদ্দুআ আমরা করি না বোন! ও নিশ্চয় একদিন বুঝবে। ওকে যে বউই অন্ধ ক'রে রেখেছে।'

একজন বলল, 'সুন্দরী বউ না। রূপের ঝলকে কানা হয়ে গেছে। একদিন ওর চোখ অবশ্যই খুলবে।'

ইত্যবকাশে শোরগোল শুনে এক-দুই ক'রে কত পুরুষ, কত মহিলা গোয়াল বাড়ির আঙ্গিনা পূর্ণ ক'রে ফেলল। মনে হল এক্ষণে সব সিনেমা হতে ফিরে আসছে। কিন্তু কই? বধূর আগমন তো বুঝা গেল না।

বহুজনের বহু চেষ্টার ফলে বৃদ্ধের সংবিৎ ফিরে এল। সকলেই স্বস্তিবোধ করল বটে কিন্তু জীবনের খুব একটা ভরসা রাখতে পারল না। অধিক যন্ত্রণায় বৃদ্ধ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করতে লাগল। পুনরায় যেন রক্ত বের হওয়ার উপক্রম হল। সকলে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে স্থির থাকতে অনুরোধ করল। এত রাত্রে তো ধৈর্য ও অপেক্ষা ছাড়া কোন উপায় নেই। গ্রামে তো কোন ডাক্তারই নেই। ভোর হলে তবেই গাড়ি ক'রে নিয়ে যাওয়া যাবে।

ততক্ষণে এক এক ক'রে সমবেত মানুষের সংখ্যা কমতে লাগল। ভিড় যখন একেবারেই কমে গেল, তখন বৃদ্ধ চরম জোরে একটি নিশ্বাস টেনে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, 'উ---ঃ।'

তারপর আর কিছু বলল না। তার মনের ভিতরটা যেন কিছু বলার জন্য গুমরে গুমরে উঠছিল। কিন্তু চেষ্টা সত্ত্বেও তা বিফল হচ্ছিল। নিদারুণ দুঃখে ও ধিক্কারে তার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছিল। অন্তরে যেন কোন

শোকাগ্নি দাউদাউ ক'রে জ্বলে উঠে দেহের সবকিছুকে দগ্ধীভূত করছিল। কিয়ৎক্ষণ পর বৃদ্ধ পুনরায় বহু কষ্টে আহত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মতী---!'

বলার সাথে সাথে বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয় অশ্রুঝলমল হয়ে উঠল। বৃদ্ধার সাথে আরো কয়েকজন প্রতিবেশিনী ডুকরে কেঁদে উঠল। একজন প্রতিবেশিনী বধূর উদ্দেশ্যে বলল, 'আহা! কালনাগিনী রে! দুধ দিয়ে কালসাপিনী ঘরে জায়গা দিয়ে পোষা হচ্ছে!'

আর একজন বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই তো। এক এক ক'রে ও সবকে দংশাবে।'

অনেকক্ষণ পর কাজলী এসে উপস্থিত হল গোয়াল বাড়িতে। সমস্ত খবর জেনে সে সখীর নিকট ফিরে গেল। হাসীনা মৃদু হেসে সখীকে প্রশ্ন করল, 'বুড়োর আজ কী হয়েছে যে, মরা-কান্নার সুর আসছে?'

কাজলী উত্তর দিল, 'সে আজ মাথার ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। এখনও বাক্‌বন্ধ আছে।'

হাসীনা উন্নাসিকতার সাথে বলল, 'তাই নাকি? মরেনি?'

---না।

---মহাপাপীর কঠিন জীবনই হয়। সহজে মৃত্যু আসবে না ওর।

কাজলী দুশ্চরিত্রা হলেও হৃদয়হীনা নয়। সে বলল, 'তোমাদের ভুল বুঝাবুঝির ফলে ঘটিত এই কলহকে মহাপাপ বলে না। মরতে তো সকলকেই হবে।'

কাজলী আরো একটি কথা বলবে কি না ভাবছিল। কিন্তু হঠাৎ সে বলেই ফেলল, 'সখী! আর একটা কথা শুনবে?' বলেই ক্ষণেক মুচকি হাসল। তারপর সখী অনুমতি দিলে বলল, 'তোমাকে তোমার শাশুড়ী

আজ খুব ডাকাহাঁকা করেছে। থাকলে যেতে?'

হাসীনা অবাক হয়ে ওষ্ঠ বঙ্কিম ক'রে বলে উঠল, 'আমাকে ডাকাহাঁকা? তা কেন? আমি যেতাম? আমি তো ছোটলোক নই যে, কালকের কথা ভুলে যাব। তার না হয় লজ্জা নেই বলে আমাকে ডাকতে এসেছিল। কিন্তু আমার লজ্জা আছে, মান আছে, জাতের মেয়ে জাত আছে। তবে আমি কেন তার ডাক শুনে যাব? তুমিই বল না, তোমারই সামনে একদিন আমাকে 'অজাত মেয়ে' বলেছিল। তারপর আরো কত কী বলে গালাগালি ও গঞ্জনা-ভর্ৎসনা করেছিল। তা কি তুমি ভুলে গেছ? আর তুমি ভুললেও, আমি ভুলব না।'

---সবই শুনেছিলাম, মনেও আছে। বেশ তাই যেয়ো না। তবে ঘরে ঘরে চিরদিন এমন আঁটাআঁটি ক'রে থাকা ভাল নয়। বিপদ সবারই আছে।

---না হলে উপায় কী? জানো তো? তোমার সাথে মিশাতে কত কথা আমাকে শুনিয়েছে। তোমার সম্পর্কে কত বিশ্রী বিশ্রী কথা আমাকে বলেছে। সেগুলি কি সহজে ভুলে যাব বলছ? আর তুমিও কি সেসব ভুলে আমাকে উপদেশ দিয়ে যেতে বলছ?

কাজলী দেখল, তাদের মিল-গরমিলে তার কোন লাভ নেই। সুতরাং প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে সখীর মনকে পূর্ববৎ খুশ করতে নতুন নাগরের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। বলল, 'আচ্ছা সখী! সে আজকে এল না কেন বল তো? দু'জনে এত অনুরোধ করা সত্ত্বেও ঘাড় পাতল না। শুধু বলল, পরে যাব।'

---সে তো আর আমাদের মতো মেয়ে মানুষ নয় যে, যখন-তখন মেয়ে মানুষের সাথে যে কোন ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। তার কি ভয়

নেই বলছ?

---ঠিকই বলেছ।

হাসীনা গুলবদনে গোলাপের মতো হেসে উঠল। কল্পনায় চলে গিয়ে বলতে লাগল, 'না, ব্যবহার বটে! দেখতে সুন্দর ও হ্যান্‌সামও বেশ! কিন্তু তুমি কেন এ সাক্ষাৎ হঠাৎ করিয়ে দিলে বল তো?

---আমি প্রেম করতে ভালবাসি, প্রেম দেখতে ভালবাসি। তাছাড়া কত কী খেতে পেলাম বল তো?

দু'জনেই হেসে উঠল। তারপর হাসীনা আবার বলতে লাগল, 'কী সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি মনোমুগ্ধকর কথা! শুনে মন ভরে যায়। মনে হয়, আরো কিছু বলুক। তারপর আরো কিছু। চেহারার সাথে তার ব্যবহারের যেন অপূর্ব মিল রয়েছে। আসলে শিক্ষিত অনেকে হয়, কিন্তু এমন ভাষা ও ব্যবহার সবারই হয় না। একবার গোপনে এখানে নিয়ে এস। ভাল ক'রে পাঁচটা গল্প শুনব। না কী বল?'

---আলবৎ, আলবৎ। আগামী রাতে আমরা ওকে সঙ্গে ক'রে সরাসরি এখানে নিয়ে আসব। কিন্তু তার আগে কিছু নাস্তা-পানি প্রস্তুত রেখে যেতে হবে।

---ঠিক বলেছ। সে তো অনেক কিছু খাইয়ে দিল। মিষ্টি, বাদাম, চানাচুর, পাঁপড় ভাজা।

---এবার হাসীনা চকিতা হয়ে ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি ফিরাল। দেখল, রাত পার হতে চলেছে। কাজলীর উদ্দেশ্যে বলল, 'সখী! এবার একটু ঘুমানো যাক।'

কিন্তু সেই পুলকে ঘুম কি আসে? একটু পরেই কাজলী সখীর মাথায় হাত রেখে বলল, 'এই! ঘুমিয়ে গেলে?'

---না, ঘুম আসতে চায় না।

---তুমি আবার মন্টুর প্রেমে পড়ছ না তো?

---মন বড় আজীব সখী! 'আঁখি তো অনেকে হেরে, বল কারে মনে ধরে? তবে তারে মনে ধরে, যে হয় মনোরঞ্জন।' এক এক পুরুষের এক এক বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্য দেখেই প্রেম সৃষ্টি হয়। একটা বিশেষ গুণ লক্ষ্য করেই নায়িকা নায়ককে ভালবেসে ফেলে। কারো ভাল ভাষা দেখে ভালবাসা আসে, কারো কাব্যশৈলী দেখে, কারো সাহিত্য-সাফল্য দেখে, কারো রূপ দেখে, কারো ধন দেখে মন ভালবাসতে চায়। আর সে ভালবাসায় মানব-মন নিরুপায় হয়ে যায়। এক সঙ্গে একাধিক পেলে একাধিক নায়ককেই ভালবাসতে চায় মন।

---আচ্ছা! বিয়ের আগেও কি কোন যুবক পড়েছিল তোমার প্রেমে?

---সে কি আর বলতে হয়? এক নয়, একাধিক। একজন সুন্দরী কলেজে পড়বে, কত ছেলের সাথে উঠা-বসা করবে, অথচ আকর্ষণ হবে না? আকর্ষণীয় প্রতিভার প্রতিভাত হবে না মনে?

---দু-একটা প্রেমিকের কথা শোনাও না সখী!

---সে মনের কথা মনেই থাক সখী! সেসব পুরনো স্মৃতি তুলে কোন লাভ নেই।

---আচ্ছা! মতী ভাইয়ের সাথে তোমার প্রেম ক'রে বিয়ে হয়নি তো?

---না, প্রেম ক'রে নয়, তবে পছন্দ ক'রে। ও তো আমার দু ক্লাশ উঁচুতে পড়ত। ওই পছন্দ ক'রে আমার বাড়িতে ঘটক পাঠায়।

---তোমার পছন্দ ছিল?

---থাকবে না কেন? ভাল রিজাল্ট্ করত। ভাল ভাষা বলত।
---আর ভাল ভাষাটাই তোমার ভালবাসা হয়ে গেল বল?
হাসীনা দীর্ঘ হাই তুলে বলল, 'থাক সেসব গোপন কথা।'
অতঃপর কাজলী একছত্র কবিতা পাঠ করল,

'এ যে সখী সমস্ত হৃদয়।
কোথা জল কোথা কূল, দিক হয়ে যায় ভুল,
অন্তহীন রহস্যনিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী,
এ তবু তোমার রাজধানী।।'

তারপরই সকলে ঘুমিয়ে পড়ল।

(১০)

কিন্তু গোয়াল-বাড়িতে বৃদ্ধার কি ঘুম আছে? শোকাহত হৃদয়ে তন্দ্রাও তো আসবে না। একদিকে যেমন কর্তা বাঁচবে, নাকি বাঁচবে না, তার এক বৃহৎ দুশ্চিন্তা, অপরদিকে বধূর এত বড় নিষ্ঠুরতা ও জিদ দেখে হৃদয়ের দুঃখ-কষ্ট তাকে বিচূর্ণ ক'রে ফেলছিল। ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছিল। ইতিমধ্যেই ফজরের আযান শোনা গেল।

পক্ষীকুলের বিচিত্র কলরোলে অভিমানী বিভাবরী যখন নিজ অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রে সৃষ্টির প্রতি আড় নয়নে দৃকপাত করল, তখন প্রতিবেশীর অনেকেই বৃদ্ধের অবস্থা দর্শন করতে এসে পরামর্শ দিল, 'এই রোগীকে গরুর গাড়ি ক'রে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তার চেয়ে বরং ডাক্তারকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসাই ভাল।'

একজন ছুটল সাইকেল নিয়ে। পাড়াগ্রামে হয়তো পারস্পরিক এই সহমর্মিতাই একটি মহৎ গুণ। অনেকে বলাবলি করতে লাগল, 'হয়তো আর বাঁচবে না। কারণ শরীরের প্রায় সব রক্তই হয়তো শেষ হয়ে গেছে। এই সময় যদি মতীকে একটু খবর দেওয়া হত, তাহলে হয়তো বা সে এসে যথাবিহিত ব্যবস্থা নিত। কেননা, নিজের ছেলের মতো তো আর কেউ করবে না।'

অন্য একজন বলল, 'করবে না তো ঠিকই। কিন্তু সে কি আর নিজের ছেলে আছে? সে তো স্ত্রীকে প্রাধান্য দিয়ে পরই হয়ে গেছে। এখন সে মায়ের পুত নয়, শাশুড়ীর জামাই। তবে তাকে খবর দিয়ে আর লাভ কী? বাড়ির পাশে বউ রয়েছে, সেও তো একবার চোখের দেখা দেখে যেতে পারত? শাশুড়ীকে কিছু সান্ত্বনাবাক্য দিয়ে সাহস দিতে পারত? কিন্তু কোথায়? একান্ত আত্মাসূত্রে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তার মনে কোন দয়া-মায়া নেই, কোন সহানভূতি নেই, কোন চক্ষুলজ্জা নেই।'

কর্ত্রী বাধা দিয়ে বলল, 'ছাড়। ওদের কীর্তন আর গেয়ো না। আমাদের কেউ নেই। সব মারা গেছে। আমাদের আল্লাহ আছেন। আমাদের আমরা আছি। দশ আছে, গ্রামের লোক আছে। মতী আমাদের কেউ নয়। তার সেই আদরের নামখানি আমরা আমাদের হৃদয় থেকে ধুয়ে-মুছে ফেলে দিয়েছি। ও মতী এক সময় আমাদের চোখের জ্যোতি ছিল। কিন্তু এখন ও আমাদের ক্ষতি। যে মোতি মালা হয়ে গলায় শোভা পাচ্ছিল, তা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পায়ের তলায় পড়ে গেছে। তাকে সংবাদ কেউ দিয়ো না। সে আসবেও না। আর এলেও ভাঙ্গা হৃদয় জোড়া দিতে পারবে না।'

কথাগুলি বলে কর্ত্রী 'হো-হো' ক'রে কেঁদে উঠল। সকলেই বলে উঠল, 'পিতা-মাতার প্রতি শিক্ষিত ছেলে-বউয়ের এই ব্যবহার? এই কি তাদের প্রতিদান?'

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার এসে দেখল বটে, কিন্তু কোন আশা দিতে পারল না। শরীরে রক্তের দরকার। হার্টও বড় দুর্বল। প্রেসারও রয়েছে। ভাগ্যের জোর ছাড়া সুস্থ হয়ে ওঠা অসম্ভব।

শোকার্ত বেদনাহত মন নিয়ে দিনটা কোন রকম পার হয়ে গেল। সম্মুখে এসে পড়ল আবার সেই ভয়াবহ রাত্রি। যত রাত্রি বাড়ে, বাড়ি থেকে লোকজন তত কম হতে থাকে। প্রতিবেশিনী হলেও কতক্ষণ সাথে থাকবে? নিদ্রার আহবানে সবাই কর্ত্রীকে কর্তার পাশে একাকিনী ছেড়ে গেল। রাত্রি যত গভীর হয়, বৃদ্ধার মনের ভয় তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একা থাকতে ভয় লাগে।

অন্যদিকে বৃদ্ধের অস্থিরতা যেন ক্রমাগত বর্ধমান হল। কিছুক্ষণ পর সে যখন ওপর দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে যেন ভয়াবহ কিছু দেখতে লাগল, তখন বৃদ্ধা আরো ভয় পেয়ে গেল। কর্তব্যের কথা ভুলে গিয়ে হতভম্ব হয়ে বসে রইল। তারপর চোখের পাতা নামিয়ে কর্তা কর্ত্রীর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। দেখা গেল, তার নয়ন কোণে অশ্রুবিন্দু জমে আছে। কর্ত্রীও তার প্রতি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু মুখ বন্ধ। কোন শব্দ নেই। ক্ষণেক পরে কর্ত্রী প্রশ্ন করল, 'মতীর আব্বা! কিছু বলবে? পানি খাবে?'

কর্তা এবারে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'দা-দু!'

তারপর আর একবার বলল, 'ম-তী'

তারপর আরো একবার, 'পা-নি।'

অতঃপর শেষবারে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা----।'

তারপর আর কিছু বলল না। থেমে গেল মুখ। থেমে গেল স্পন্দন। চোখের পাতা বন্ধ হয়ে গেল। আল্লাহর দূত তাকে নিয়ে চলে গেল।

বৃদ্ধা তখনও কিছু বুঝতে পারেনি। সে কেবল তার মুখের প্রতি হতবাক হয়ে তাকিয়েই ছিল। আর তার চক্ষে ছিল বিগলিত অশ্রুর শ্রাবণ-ধারা।

বৃদ্ধা ভাবতেও পারেনি যে, বৃদ্ধ চির-বিদায় নিল। সে এক্ষুনি তাকে চিরতরের জন্য একাকিনী রেখে চলে গেল। আর যাবার সময় তাকে বলেও গেল না।

বহুক্ষণ পর বৃদ্ধা প্রকৃতিস্থ হল। বৃদ্ধের কপালে হাত রেখে সে চমকে উঠল। দেহ যেন ঠাণ্ডা পাথর। চোখের পলক দুলে না। সে কয়েকবার ডাক দিল, 'মতীর আব্বা!' কিন্তু কোন সাড়া পেল না। শিয়রে শরবত মুখে দিল। কিন্তু সে কি আর পান করবে? কিছু আগে সে পানি চেয়েছিল, কিন্তু বৃদ্ধা তা বুঝতে পারেনি। নিথর দেহটাকে নিয়ে হিলিয়ে জাগাতে চাইল। কিন্তু সে কি আর আছে যে জাগবে? অতঃপর সে খুব ভয় পেয়ে গেল। মনে হল, সেই যেন এখন 'মালাকুল মাওত' দেখতে বসেছে। কান খাড়া ক'রে কারো কোন শব্দ আছে কি না, জানার চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবেশীর কোন জাগ্রত মানুষের কোন শব্দই পেল না। কেবল বড় বাড়ির ভিতর থেকে হাসির শব্দ শোনা গেল। একটু পর মনে হল, কে যেন বাড়ির দরজা খুলে বের হয়ে আসছে। কিন্তু এলেও তাকে ডাকবার নয়। একাই মনকে শক্ত করল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় যেমন পানি বরফ হয়ে জমে যায়, অতি শোকের চাপে বৃদ্ধার চোখের পানিও তদ্রূপ জমে গিয়েছিল। বুক ফেটে যায়, তবুও

মুখে কোন শব্দ নেই। কেবল অন্তঃসলিলা নদীর মতো অন্তঃস্রোতে তার বক্ষ ভাসমান ছিল।

কিন্তু ক্ষণকাল পরে বৃদ্ধা 'ও আমার কপাল রে!' বলে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠল। সেই কান্না শুনে কাজলী থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হাসীনাও সে শব্দ শুনে মৃদু হেসে সখীর উদ্দেশ্যে বলল, 'বুড়ো মরছে নাকি?'

কাজলী পূর্বের শব্দের প্রতি কান খাড়া রেখে জবাব দিল, 'তাও হতে পারে।'

আজ সিনেমা দেখার পর তাদের সেই মনোহর নাগরকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল। বহুক্ষণ গল্প ও আনন্দের মাঝে কাটিয়ে তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য দুই সখীতে বাহির দরজা পর্যন্ত এসেছিল। আরো কান্না-শব্দে তাদের সন্দেহ যখন দূর হল, তখন তারা উভয়ে কোন এক দুর্ভাবনায় আপতিত হল। কারণ, সত্যসত্যই যদি 'বুড়ো' মারা যায় এবং সে এ বাড়িতে থাকে, তাহলে নিশ্চয় তাকে একবার গিয়েও দেখা ক'রে আসতে হবে। নচেৎ গ্রামের লোকে তাকে 'ছিঃ' করবে। সুতরাং দুই সখীতে পরামর্শ করতে লাগল, কী করা যায়?

অবশেষে স্থির করল যে, ভোরে ভোরে তারা পিত্রালয়ে চলে যাবে। তাহলে সবাই জানবে যে, বউ বাড়িতে নেই।

ঠিক হলও তাই। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ব্যাগে ভরে ঘরে তালা বন্ধ ক'রে কাজলীকে সাথে নিয়ে হেঁটে-হেঁটেই অনতি দূরের বাপের বাড়ি পৌঁছে গেল।

এদিকে ফজর হতেই কর্ত্রীর বাড়ি লোকে ভরে গেল। কোথায় কোন্ আত্মীয়কে খবর দিতে হবে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল, 'মতী ও তার শ্বশুর বাড়িতে যেন এ খবর না যায়। বাকী যে যেথায় আছে, সেখানে লোক পাঠানো হোক।'

এ কথা সকলে মেনে নিল বটে, কিন্তু রশীদার মন কোন মতেই মানল না। বধূর কার্যকলাপের কারণে না হয় তাকে খবর না দেওয়া হল, কিন্তু মতীকে অন্ততঃ খবর দেওয়াটা উচিত। পিতার একমাত্র সন্তান নিশ্চয় মৃত্যু-সংবাদ শুনে এসে একবার তার শেষ দর্শন ক'রে দাফনকার্য সমাধা ক'রে যাবে। সুতরাং রশীদা গোপনে তাদের বাড়ির একজনকে শহরে পাঠিয়ে দিল।

(১১)

মতীর কূট বুদ্ধিমতী অর্ধাঙ্গিনী হাসীনা কিন্তু পিত্রালয়ে বসে নেই। সেও তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সকালেই শহরে পাঠিয়ে দিল এই বলে যে, তার ও আহসানের নাকি বড্ড অসুখ হয়েছে। অতএব সে যে পায়েই থাকুক, সে পায়েই যেন সত্বর একবার দেখা ক'রে যায়।

দুই জন সংবাদবাহক একই সাথে মতীর রুমে গিয়ে উঠল। প্রথমে সংবাদ শুনল যে, প্রেয়সী স্ত্রী ও পুত্রের চরম অসুখ। হাসীনা কয়েক দিন ঠিকমতো ঘুমাতে পারেনি। বাবা জীবন আহসান ঠিকমতো খাচ্ছে না। আর দ্বিতীয় সংবাদ স্নেহ-বন্ধন ছাড়া পিতার আকস্মিক মৃত্যু। এই দুই সংবাদের মাঝে মতী গতিহীন গাড়ির মতো থেমে গেল। গেলে কোথায় আগে যাবে?

যাবার পথেও সে ভাবছিল, কোথায় সে আগে যাবে? পরিশেষে শ্বশুরবাড়ির বাস-স্টপেজে সে অবতরণ করল। ভাবল, স্ত্রী-পুত্রকে দেখা ক'রে বাড়ি ফিরবে।

শ্বশুরালয়ে এসে দেখল, স্ত্রী বেশ আরামে পালঙ্কে আহসানকে নিয়ে

ঘুমিয়ে আছে। বেলা প্রায় ১১টা বেজে গেছে। শালাজ তাকে জাগিয়ে দিল। মতী বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

---কী আবার হবে? অসুখ হয়েছে। এই দেখ না কত জ্বর?

মতী ভিতরে গিয়ে তার কপালে হাত রেখে দেখল, তাপমাত্রা স্বাভাবিক। বলল, 'কই? জ্বর নেই তো।

---তাহলে কমে গেছে।

মতী মনে হয় অভিনয় বুঝে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, 'আব্বা মারা গেছে। আমাকে বাড়ি যেতে হবে।'

হাসীনা গা মুড়ে বলল, 'তবে যাও না। এখানে কী জন্য এলে?'

---ভারি মুশকিল! তোমার অসুখ শুনেই তো এলাম।

হাসীনা স্বামীর হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে বলল, 'তবে ক্ষান্ত হও। অধৈর্য হয়ো না। সব বলছি। তোমার কোন্ আব্বা মরেছে? তোমার আব্বা তো অনেক আগেই মারা গেছে। তুমি আবার কিসের টান দেখাচ্ছ? আর মরেছে তো এখানে খবর দিল না কেন? আমাদের প্রতি অনীহা আছে বলেই তো?'

মতী আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলল, 'কী বলছ তুমি? এখানে খবর দেয়নি?'

---না, আমার বাড়ির কাউকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, জানে কি না?

তারপর হাসীনা দরজা বন্ধ ক'রে স্বামীকে বিছানায় টেনে কোন্ যন্ত্র দ্বারা কোন্ মন্ত্র দিল যে, মতী সাপুড়ের সাপের মতো ঝাঁপিতে মাথা গুঁজে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কী আশ্চর্য সেই নারী-যন্ত্র! কী আজব সেই সম্মোহন-মন্ত্র!

পিতাকে শেষ দর্শন করার যে সংকল্প সে করেছিল, তাও মন্ত্রমুগ্ধ

হয়ে পরিহার করল! পরের দিন স্ত্রীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে শহরে ফিরে গেল।

ওদিকে দাফনকার্য সমাপনের পূর্ব পর্যন্ত রশীদা পথ পানে চেয়েছিল, যদি সে আসে। কিন্তু সারা দিন কেটে যাওয়ার পর মাগরিবের পরে জানাযা ও দাফনকার্য সমাপ্ত করা হল।

সকলের বুঝতে বাকী থাকল না যে, সেই কূটবুদ্ধির বউই তাকে আসতে দেয়নি। ভেড়ুয়া মরদকে সে সম্পূর্ণ বশীভূত ক'রে ফেলেছে।

আর কর্ত্রী? তার দগ্ধ হৃদয় এ নির্মম দহনে কি অটল থাকতে পেরেছে? পারবেই বা কেমন ক'রে? যে ছেলেকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ ক'রে, দুই-আড়াই বছর নিজের বুকের দুধ পান করিয়েছে, যাকে কোলে-পিঠে আদরের সাথে মানুষ করেছে, টাকা-পয়সা বাঁচিয়ে তার পিছনে খরচ ক'রে তাকে শিক্ষিত করেছে, সেই ছেলে একটি বারও জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় নিজ পিতাকে দেখে গেল না।

আর পুত্রবধূও তো। চোখের সামনে থেকেও একবারও তো বিপদে দেখলই না। উল্টে সেই দুঃখের সময়ে বাড়িতে আনন্দ-মেলা বসিয়েছিল। আবার মৃত্যু-সংবাদ শুনেও এ বাড়ি ছেড়ে রাতারাতি পলায়ন করল! যে মায়াবিনী নিজের কামনা ও স্বার্থসিদ্ধির লোভে কোলের সন্তানকে চিরদিনের জন্য ছিনিয়ে নিল।

আর চিন্তা? যার আশায় তার বাসা বাঁধা ছিল, যার বর্তমানে বাঁচার অভিলাষটুকু বিদ্যমান ছিল, আজ সেই এ সংসার হতে বিদায় নিয়েছে। তাই সেই সাথে তার আশা-ভরসা ও বাঁচার অভিলাষ বিলীন হয়ে গেছে। বাঁচার আগ্রহ থাকবেই বা কেন? সে যে বৃদ্ধা। কোথায় কার নিকটে গিয়ে দাঁড়াবে? কীভাবে তার জীবিকা নির্বাহ হবে?

এদিকে তার সাধের বাড়ি ও আশার বাসাও কেলি-ভবনে পরিণত হয়েছে। ইতিমধ্যে গ্রামের লোকে রীতিমতো সমালোচনা করতে শুরু ক'রে দিয়েছে। আর ডোগলা বউ-পাগলা ছেলে তো প্রত্যক্ষদর্শী না হয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে না। অবশেষে ঐ বাড়ি-সম্পত্তি হয়তো উড়ে যাবে, কার বসবাস করার কথা, আর কে বসবাস করবে। কর্ত্রী শুধু ভাবে, আর এই কথাই বলে, 'হায়রে সম্মোহনী ফুল! জানতে পারিনি যে, তোর মাঝে এত বিষ ছিল! কোন্ সে চিত্তাকর্ষী ফুল তুই, যার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তুলে সুঘ্রাণ নিতে গিয়ে আমার শিক্ষিত ছেলেও বিষিত হল?'

যে আশায় কর্তা এত কিছু ক'রে সুখের স্বপ্ন দেখেছিল, কোথায় সে আশাভরা অভীষ্ট সুখ? সে আশার জমা পাহাড় নিয়েই সে ইহলোক ত্যাগ ক'রে পরলোকে যাত্রা করল। বৃদ্ধারও কি কোন আশা থাকতে পারে? সব আশা দুরাশা তার, নিরাশার আঁধার।

প্রায় সমবয়স্ক মহিলা রশীদা কর্ত্রীকে নানারূপ সান্ত্বনা ও অভয় দান ক'রে তার সকল দুঃখ ও দুশ্চিন্তাকে দূর করতে অনুরোধ করল। আল্লাহর উপরেই পূর্ণ আশা ও ভরসা রেখে জীবনভর তাঁকেই সন্তুষ্ট ক'রে মৃত্যুবরণ করতে উদ্বুদ্ধ করল। আহা! তবুও কি মন মানে? তুফানে ঘর ভেঙ্গেছে, তুফান তো এখনও থামেনি, তাহলে সে ঘর নতুন ক'রে বাঁধার স্বপ্ন কি বৃথা নয়?

শোক যখন আসে, তখন সে একলা আসে না, বিগত কত শোককে টেনে আনে। ঈপ্সিত কিছু না পেলে মন দুঃখ পায়; কিছু পেয়ে অন্য কিছু হারালে মন অসুখী হয়। কিন্তু অভীষ্ট সব পেয়ে সব হারাবার যে দুঃখ, তা অতি ভীষণ, অতি মর্মান্তিক।

(১২)

পক্ষীকুল যখন আপন আপন কূলায় ফিরে কিচিরমিচির শুরু করেছিল, মসজিদের মুআয্যিন যখন মাগরিবের সুমধুর আযান-ধ্বনিতে গ্রামের আকাশ-বাতাশ মুখরিত ক'রে নামাযের জন্য আহবান করছিল, ঠিক তখন খিলিখিলি হাস্য করতে করতে ঝিনিকিঝিনি শব্দের নূপুর পায়ে কাজলী সখীর ঝিলিমিলি হাস্যোজ্জ্বল মুখের অভ্যর্থনা গ্রহণ ক'রে তার বাড়িতে প্রবেশ করল। এক হাতে মিষ্টির বড় ঝাঁকা। অপর হাতে একটি চমৎকার লেফাফা। অতি শীঘ্রতার সাথে হাসীনা তা নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে পড়তে লাগল আর মিঠা মিঠা হাসতে লাগল। কী জানি কী লেখা আছে চিঠিতে?

কাজলী সখীর সমুজ্জ্বল প্রদীপ্ত আরক্তিম মুখশশীর প্রতি তাকিয়ে মধুময় হাসি হাসছিল। সে জানে বৈকি?

কিয়ৎক্ষণ পর সে সখীকে প্রশ্ন করল, 'কী লিখেছে? জোরে জোরে পড় না সই!'

হাসীনা ফিক ক'রে হেসে বলল, 'তুমি পড়নি?'

---সে নিষেধ করেছিল খুলতে।

হাসীনা আদ্যন্ত পাঠ ক'রে সখীকে শুনিয়ে দিল। চিঠির শেষে উর্দু অথবা হিন্দী ভাষার একটি কবিতাছত্র রয়েছে। বাঙ্গালীদের মাতৃভাষা বাঙ্গালী হলেও স্কুলে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী পড়ানো হয়। তাছাড়া সিনেমা-টিভিতে তো হিন্দী ফিল্ম্ দেখে প্রায় লোকের হিন্দী জানা। কাজলীরও জানা থাকার কথা। তবুও বুঝে অথবা না বুঝে সে সখীকে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা সখী! ঐ কবিতাটার মানে কী? ঐ যে শেষে পড়লে,

'খুশবূ আ নেহী সকতী কাগজূঁ কে ফুলূঁ সে,
হকীকত ছুপ নেহী সকতী বনাঅট কে অসূলূঁ সে।'

---এর মানে, এক কথায় সে আমাকে তার জীবনে একান্ত আপন ক'রে পেতে চায়। আর আমাদের ভালবাসাকে মেকি-ফাঁকি ভাবছে। দেখ তো, আমি একজনের স্ত্রী, আবার ছেলের মা। তা সত্ত্বেও কেমন আশা, কেমন চাওয়া!

এ প্রেম কাজলীরই সংঘটিত। এ প্রেমের সৌধ মহলের পরিপূর্ণতা কাজলী দেখতে চায়। তাই সে বলল, 'মনে মনে মিল থাকলে কিছুই অসুবিধে হয় না।'

এরপর এল ঝাঁকা খোলার পালা। দেখল দামী দামী মিষ্টান্নের উপরে পলিথনের কাগজের ভিতরে একটি চিরকুট লেখা। তাতে যা লেখা আছে, তা বুঝতে হাসীনা বারবার পড়তে লাগল। অর্থ যখন তার বুঝে এল, তখন তার দেহে যেন বিদ্যুৎ ছুটতে লাগল। সখী তার মুখমণ্ডলের আয়নায় সে কথা আন্দাজ ক'রে বলল, 'দেখি, দেখি, ওতে কী লেখা রয়েছে?'

---আমিই পড়ছি শোনো,

উপহার এই প্রেমের মিঠাই নিয়ে ভেব বুদ্ধিমান,
প্রিয়-প্রিয়ার মধুর রীতে মিষ্ট কর তিক্ত প্রাণ।

কাজলী আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিতা হয়ে বলে উঠল, 'চমৎকার! মিষ্টির বদলে মিষ্টি!'

সখীর কথায় হাসীনা উল্লাসে হেসে বলল, 'দেখেছ? যারা ভালবাসতে জানে, তারা কত সুন্দর সুন্দর কথা জানে।'

---ঠিকই বলেছ। যাদের মনে ভালবাসার বাগান আছে, তারা ফুল ভালবাসে, কবিতা, গজল ও গান ভালবাসে।

তারপর সে পুলকিত যামিনীর প্রায় সারাক্ষণটাই দুই কামিনী মিলে প্রেম-ভালবাসার আলোচনায় মত্ত রইল। শেষের দিকে পত্রের প্রত্যুত্তর লিখে দুই সখীতে কিছুক্ষণের জন্য সুষুপ্তা হল।

বেলা আটটার সময় কাজলী মন্টুর বৈঠকখানায় গিয়ে উপস্থিত হল। মন্টু তাকে দেখেই যেন লাফিয়ে উঠল এবং কোন সংবাদ জানার আগেই তার হাত হতে লেফাফাটি ছোঁ মেরে নিয়ে খুলে পড়তে লাগল। কী সুন্দর তার কথা-শিল্পতা! কী সুন্দর তার ভাষা! তারই নিচে কী বাহারের ফুল আঁকা! ফুলের মতো মন না হলে কি কেউ এত সুন্দর ফুল আঁকতে পারে? মনের ভিতরে প্রেমের আকুলতা না থাকলে কি কেউ এত সুন্দর প্রেমপত্র লিখতে পারে? তার সাক্ষাৎ দর্শন ও কথোপকথনে এরূপই মনে হয়েছিল মন্টুর। মনে হচ্ছে সে যেন চিঠি পড়ছে না, বরং সুহাসিনী হাসীনা যেন তার সাক্ষাতে আলাপ করছে। আহা! সে যদি তার জীবনসাথী হতো!

তারপর মন্টু কাজলীকে প্রশ্ন করল, 'সাক্ষাৎ করার কথা বলেছিলাম। কিছু বলেনি সে ব্যাপারে?'

---কাল রাত্রে আহসান ঘুমিয়ে গেলে হাজী-পুকুরের পাড়ে এসে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার কথা বলেছে। কেন? তোমার আবার মৌচাক ভাঙ্গার শখ হচ্ছে নাকি? জানো তো মৌমাছির হুলের জ্বালা?

মন্টু হেসে বলল, 'তা জানলেও তোকে পুরস্কার দিয়ে মন্ত্র শিখে নেব, তাহলে আর মৌমাছি হুল ফুঁড়তে পারবে না। তোকে যখন উকিল ধরেছি, তখন জিত আমার অবশ্যই হবে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

---সত্যি? কিন্তু তার যে স্বামী আছে, ছেলে আছে!

মন্টু আবারও হেসে বলল, 'এ ক্ষেত্রেও উকিলের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। তুই যা বলবি, আমি তাই করব।'

---কিন্তু এ সব কথা যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।

---ক্ষেপেছিস? তুই বরং তার সাথে পরামর্শ ক'রে দেখবি, কী করলে ভাল হয়। আমি কিন্তু তাকে ছাড়া বাঁচব না রে! তবে ওর ইঙ্গিতে সহমত বুঝতে পারছি। এই দেখ না লিখেছে,

'খুশবূ ভী আসকতী হ্যায় আগার কাগজ মেঁ তেল হো,
হকীকত ভী ছুপ সকতী হ্যায় আগার আপস মেঁ মেল হো।'

আপসে মনের মিল থাকলে সব সম্ভব বুঝলি?

---ভাল কথা। কিন্তু সাবধানে। সেও অবশ্য বলেছে, 'এমন পুরুষ পেলে আমার জীবন সার্থক হতো।'

মন্টুর মন আরও উতলা হয়ে উঠল। বলল, 'আর একটি কথা শুনেছিস?'

কাজলী চকিতা হয়ে বলে উঠল, 'কিয়া বাত? খারাপ নয় তো?'

---আরে না, না! বাড়িতে নাকি আমার বিয়ে ঠিক করেছে। তুই এ খবর তাকে বলবি না। কারণ আমি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করব না। আর সে এ কথা শুনলে হয়তো দমে যাবে।

---ঠিক আছে। এবারে আসি তাহলে, কাল দেখা হবে কেমন!

কাজলী বিদায় নেওয়ার পরেও মন্টু সেই পুষ্পাঙ্কিত চিঠিখানা আরো কয়েকবার পড়ল। 'পড়ামাত্র পুড়িয়ে ফেলো' লেখা থাকা সত্ত্বেও সে নিজের আলমারিতে ভরে তালাবন্ধ করল।

(১৩)

দুঃখ-কাতর বৃদ্ধা কর্ত্রীর সে রাত্রে মোটেই ঘুম আসে না। বাড়ির বধূর ও কাজলীর কথোপকথনের আওয়াজ তখনও শোনা যাচ্ছিল। বধূর সাথে তার কোন সম্পর্ক এখনও গড়ে ওঠেনি। তাকে কিছু বলবারও নেই। বাঁধন-ছাড়া শাসন-হারা মেয়েকে আবার কে কী বলতে যাবে? সেই জন্য সে তাদের ব্যাপারে কোন নাক গলায় না, তাদের কোন কথায় কানও দেয় না। ঘুম আসছে না বলে গরমে একটু হাওয়া খেতে বৃদ্ধা আঙ্গিনায় নেমে এল। এবারে যেন বড় বাড়ির ভিতর থেকে সে সিগারেটের তীব্র গন্ধ পেল। এত রাত্রে এখানে সিগারেট খাচ্ছে কে? মতী কি এসেছে? তাছাড়া সে তো সিগারেট খায় না, তার বাপও খেতো না। তাহলে কাজলী কি সিগারেট খায়? তা-ই বা অসম্ভব কি? সে তো আর ভাল মেয়ে নয়।

বৃদ্ধার ভয় হল, বধূর চরিত্রের ব্যাপারে। যদি সেও কাজলীর অনুকরণ করে, তাহলে কী হবে? ছেলের মান যাক, তা সে চায় না; যদিও সে পর হয়ে আছে। রক্তের টান আছে, মাতৃত্বের বাঁধন আছে। সে এ সাজানো-গুছানো ধর্মের ঘরে পাপের বাসা দেখে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হল। তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। যে গৃহে কুরআন পঠিত হত, নামায প্রতিষ্ঠিত হত, যে গৃহের আনাচে-কানাচে সুখ ফুলের বসন্ত ছিল, সে গৃহ আজ নন্দনগৃহে পরিণত হয়েছে!

বলার যদিও কিছু নেই, বললেও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, তা জেনেও কর্ত্রী নিজ মনকে বাধা দিতে পারল না। পুত্র বাড়ি থেকে বঞ্চিত করলেও সে বাড়িতে তার অংশ আছে, দাপ আছে। সে

বাড়িতে এমন পাপের বাসা কেন হবে? প্রতিবাদ না ক'রে চুপ থাকলেও তা বড় অন্যায়। সুতরাং মনের সাহস এনে সকালে কাজলীকে একটি শিশুকন্যা দ্বারা ডেকে পাঠাল। কাজলী ভয় পেল। হাসীনা সাহস দিয়ে বলল, 'যেয়ো না।'

তাদের মনে আশঙ্কা হল, হয়তো কর্ত্রী গত রাত্রের কিছু না কিছু বুঝতে পেরেছে। তাদের যাওয়ার কথা ছিল হাজী পুকুরের পাড়ে দেখা করতে। কিন্তু মন্টুরই আশা মতে সে এ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

কাজলী বলল, 'না সখী! যাই, গিয়ে ভুলটা ভেঙ্গে আসি।'

অর্থাৎ, না গেলে তো সন্দেহ আরো বাড়বে। তার চেয়ে গিয়ে কথা বলে কোন রকম বুঝিয়ে দিয়ে আসা যাবে। যুক্তি চমৎকার বুঝে হাসীনা কাজলীকে কর্ত্রীর নিকট যেতে অনুমতি দিল।

শঙ্কিত কণ্ঠে কাজলী বলল, 'চাচী! আমাকে ডেকেছ? কিছু বলবে?'

---হ্যাঁ, বলব। গত রাত্রে তুই ঐ বাড়িতে শুয়েছিলি?

কাজলী ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ। কেন?'

---তুই তো জানিস, হাসীনা আমার সাথে কী রেসারেসি শুরু করেছে। প্রত্যেক দিন ঝাড়ু দিয়ে ময়লা আমার আঙ্গিনার সামনে ফেলে রাখছে। আমাকে গোয়াল-ঘরে বাস করতে দিয়েও ওর মনে শান্তি হয়নি। শ্বশুর মরেও শান্তি হয়নি। এবার হয়তো আমি না মরলে ওদের শান্তি হবে না। সে যাই হোক, অত রাত্রে সিগারেটের গন্ধ কেন আসছিল বল তো?

কাজলী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে অপ্রস্তুত

হয়েই চট্ ক'রে বলে উঠল, 'কই না তো! অ-হ্যাঁ, তাহলে কাগজ পোড়ার গন্ধ হবে চাচী! আহসান লম্ফের আগুনে কাগজ পুড়িয়ে খেলা করছিল। হয়তো তারই গন্ধ পেয়েছ।'

কর্ত্রী বুঝল, হয়তো বা তাই হবে। কিন্তু উপদেশ ছলে বলল, 'ছোট বাচ্চাকে আগুন নিয়ে খেলতে দেয়? ঘরে আগুন লাগবে যে।'

---হ্যাঁ, তাই তো। না, তারপর সঙ্গে সঙ্গে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

আর যা হবে হোক, তার উপস্থিত বুদ্ধির উত্তর কাজে লেগেছে, তাতেই সে বড় আনন্দিতা হল। 'তাহলে যাই চাচী' বলে পড়ি কি মরি হয়ে ত্রস্তপদে হাসীনার নিকট গিয়ে পৌঁছল।

প্রশ্নের আগেই কাজলী হাঁপিয়ে বলতে লাগল, 'সর্বনাশ হয়েছিল সই! মন্টুকে সিগারেট খেতে মানা করলাম, তাও মানল না। বুড়ি তারই গন্ধ পেয়েছে।'

---তুমি কী বললে?

---আমি বললাম, আহসান লম্ফতে কাগজ পুড়াচ্ছিল।

বলেই হাসতে লাগল। হাসীনাও হাসি সামলাতে না পেরে বলল, 'বুদ্ধি বটে তোমার!'

কিন্তু তাদের এ লুকোচুরি প্রেমের খবর যে প্রচার হচ্ছে, তা হাসীনা বিশ্বাস করল না। শাশুড়ীকে তো সে কিছুই মনে করে না। অকুতোভয় হয়ে সে নিজের স্বেচ্ছাচারিতায় নির্বিচল থাকল।

বেলা দুপুরে কাজলী কুয়া থেকে পানি আনতে গিয়েছিল। রাস্তায় তার কাপড় গিয়েছিল ভিজে। তাতে তার পদক্ষেপের সাথে শট্‌পট্ আওয়াজ হচ্ছিল। ওদিকে কলসীর ভিতর থেকে ছলাৎ-ছল আওয়াজ আসছিল। তা শুনে হাসীনার হাসি আর থামে না। নিশ্চয়ই সে বড় খুশী

মনে ছিল। তাই একটা সামান্য কারণে সখীর সাথে ইয়ারকি ক'রে হাসি আর কি। কাজলীও হাসি দেখে হাসল বটে, কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারল না। কাজলী কলসীটি রান্নাশালে রেখে সুহাসিনী হাসীনার গা ঘেসে বসে গায়ে গা এলিয়ে দিয়ে বলল, 'এই! বল না, কেন হাসছ?'

তাকে চমক ধরাবার জন্য আবারও হাসল। বলল, 'এমনিই হাসলাম। 'ছলাৎ-ছল, শট্‌পট্‌' বলে আবার দুষ্টু হাসি হাসতে লাগল। কাজলী তার মুখে হাত রেখে চেপে ধরে বলল, 'বল বলছি, কেন হাসছ?'

---ছাড়, ছাড়, এবার বলছি।

কাজলী হাত সরিয়ে নিলে সে বলল, 'ছলাৎ-ছল, যৌবনের জল।'

তারপর আবার হাসল। এবার কাজলী হেসে বাড়ি মুখরিত ক'রে তুলল। তারপর থেমে বলল,

পিপাসায় পানীয় দীঘির কলসী ভরা জল,
বক্ষ ভরা যৌবন মোদের করব কত ছল!

---নয় তো কী? দুনিয়া কয় দিনের? তাই তো বলি সখী,

আমি বিনোদিনী, আমি নব প্রজাপতি,
দু' ফুলে বসেও আমি অপরূপা সতী!

জানো সখী আমার মনের খবর?

টু মনে ওয়ান মন মন্টু জীবন,
মতীর গতি শেষ প্রণয়ে কৃপণ।

কাজলী সখীর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোমার জীবনকে নতুন ক'রে সাজাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করব সই! জীবনে মানুষ প্রকৃত সুখ ও বিশুদ্ধ আনন্দই তো পেতে চায়। মন্টু সেদিন কথায়

কথায় হিন্দী বাত কী বলেছে জানো?

---কী বলেছে?

সে বলেছে তোমার জন্যই। 'আঁখ আগার রো না সকতী, দিল তো রোতা হ্যায়।'

হাসীনা মুচকি হেসে কোন ভাবাবেগে অস্থির হয়ে বলল, 'বেশ সখী! আমারও এই হিন্দী কথাটা তার কানে পৌঁছে দিয়ো, 'বেগায়র আঁসূ কে ফুল সায়রাব হোতা হ্যায়।'

(১৪)

---হাস্নুহানা! থাকতে কেন মানা? সুরভিত মনোমুগ্ধকর কুসুমকলি থেকে নাক ফিরানো বড় দুষ্কর ডার্লিং।

---ছিঃ ছিঃ! লোকে শুনলে তোমাকে বউ-পাগলা ভাববে।

---অনেক লোকে তো পরের বউয়ের সাথেও প্রেম করলে কিছু ভাবে না। আর নিজের বউয়ের সাথে প্রেম করলে 'বউ-পাগলা' বলবে। ছাড়ো তোমার লোকের কথা। আমি 'পাগল', ঠিক আছে?

---এই মরেছে! পনের দিন ছুটি কাটালে, তার উপর এই তিনদিন কামাই করলে। এতে কি তোমার পড়াশোনার ক্ষতি হবে না? না, না, তুমি আজই চলে যাও। একদিন ক্লাশ কামাই করলে, তা চল্লিশ দিনেও মেক-আপ করা যায় না, তুমি জানো না?

---বা-ব্বা! এ দেখছি বউ নয়, পাকা দিদিমণি।

---ছিঃ ছিঃ! ভাল কথা বললে পাকামি হয় বল?

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এমনই বাক্যালাপ চলছিল। এই সময়ে আহসান টেনে টেনে বলল, 'না, না, আব্বু যাবে না।'

---এই দেখেছ আমার সোনা, বলছে কথা আর যেয়ো না।

---হ্যাঁ, যেয়ো না। চাকরিটা হবে হবে ক'রে কতদিন পার হয়ে যাচ্ছে। শুধু জমির উপর ভরসা। আমার আব্বা সহযোগিতা না করলে যে কী হতো, তা ঠিক নেই। তুমি যাও। পারলে আহসানকেও নিয়ে যাও। পড়াশোনা করাও। আমি একা সামালতে পারছি না।

---ওকে নিয়ে গিয়ে রাখব কার কাছে? ক্লাশ করব না?

---তোমার অন্য বউয়ের কাছে।

---অন্য বউ আবার কে? তুমি কি চাও, আমার অন্য বউ হোক?

---কেউ কি কারো গ্যারান্টি দিতে পারে?

---তাই? তুমি বুঝি আমাকে সন্দেহ কর? আমি কিন্তু মোটেই তোমাকে সন্দেহ করি না। কাজলীর সাথে মিশতে দেখেও তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে।

প্রসঙ্গ পাল্টে দিয়ে হাসীনা বলল, 'আচ্ছা! আহসানকে প্রাইভেট দিলে কেমন হয়? স্কুলে ভরতি করার আগে বেশ প্রস্তুত হয়ে যেত।'

---তা ঠিক বলেছ। কিন্তু সে রকম টিচার কে আছে?

---ও পাড়ার মন্টুকে প্রাইভেট টিউটর ঠিক করলে কেমন হয়? ও কিন্তু আহসানকে খুব ভালবাসে। হয়তো বেশী পয়সাও নেবে না।

---দেখো আবার। সে আহসানকে ভালবাসে, নাকি তার মাকে?

---ছিঃ! দুষ্টু কোথাকার। বল না, প্লিজ। বৈঠকখানায় বসে পড়িয়ে যাবে। তুমি ওকে একটু বলে যাও না।

প্রেম গোপনে গোপনে যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, প্রেমিককে হাতের কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তত তীব্র হতে থাকে। হাসীনার বুঝি তাই হয়েছিল। মাঝে-মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ ক'রেও তার মন মানছিল না।

এখন চায়, প্রত্যেক দিন তার সাথে সাক্ষাৎ, প্রত্যেক দিন বাক্যালাপ ও সংলাপ।

মতী স্ত্রীর বাক্-চাতুর্যে কোনদিন পেরে ওঠেনি, আজও পারল না। স্ত্রী যখনই যা বলেছে, তখনই তা বাধ্য গোলামের মতো ক'রে এসেছে, তবে আজ কেন তাদের সন্তানের কল্যাণের ব্যাপারে কোন বিবেক-বিবেচনা বা লাভ-ক্ষতির বাছবিচার করবে? বাড়িতে কেউ থাকে না। মায়ের সাথে তাদের সম্পর্ক নেই। সে তাদের ব্যাপারে কোন চোখ-কান করে না। এখন একটি অবিবাহিত যুবক তার বাড়িতে এসে প্রত্যহ দুই-এক ঘন্টা ক'রে কাটিয়ে যাবে, তাতে তার কোন সন্দেহ হবে না। আসলে অতিরিক্ত উদারতা এমন জিনিস যে, পরকে বিশ্বাস করতে নিজের ক্ষতির কথার কল্পনাও হয় না। অথচ নিজে সৎ হলেও অপরকে নিশ্চয়তার সাথে সৎ ভাবা বোকামি ছাড়া কিছু নয়।

মতী কিছুও ভাবল না। উঠে গিয়ে ও-পাড়ার মন্টুকে প্রাইভেট টিউটর ঠিক ক'রে চলে এল। সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারল না যে, সে নিজের ঘরে খাল কেটে কুমীর নিয়ে এল।

সবচেয়ে বেশী খুশী হল হাসীনা। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে, প্রকৃত কারণ চাপা রেখে সে বলল, 'বা-রে! আমার ছেলে লেখাপড়া শিখবে, আর আমি তাতে খুশী হব না। আমি আমার ছেলেকে ডাক্তারি পড়াব। যাতে চাকরি না পেলে ঘরে বসে থাকতে না হয়।'

---আর যাতে বিনা চিকিৎসায় কেউ মারা না যায়। কিন্তু তোমার ছেলে আপন থাকলে তো তা হবে।

---মায়ের মতো মা হতে পারলে, ছেলেও ছেলের মতো হবে।

ভাত বেড়ে স্বামীর কাছে বসে পাখা ক'রে দিতে দিতে প্রেম-মাখা

কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আবার কবে আসবে?'

---আজ তিন তারিখ। আগামী বিশ তারিখে আসব।

---বাড়ি আসতে খুব মন টানে?

---কেন? তোমার মন টানে না?

---আমাকে একলাই বেশী ভাল লাগে।

---আজীব!

মতী আর কিছু বলল না। কারণ জানা-বুঝার চেষ্টাও করল না। অতঃপর যথাসময়ে শহরের পথে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা দিল।

বাসস্ট্যাণ্ডে গ্রামের ইমাম সাহেবের সঙ্গে দেখা। ইমাম সাহেব গ্রামের সমস্ত খবর রাখেন। যেহেতু তাঁরা গ্রামের 'বিবিসি লণ্ডন' হন। আর তাঁদের উপরে অনেক নৈতিক দায়িত্বও থাকে। সালাম-কালামের পর কথায় কথায় ইমাম সাহেব বলেই ফেললেন, 'আপনি বাড়িতে থাকেন না। আপনার বাড়িতে কাজলী বলে একটা মেয়ে আসে। ওকে কি ভাল মনে করেন? কোনদিন যদি কোন বদনাম ছড়িয়ে যায়, তাহলে তো আপনারই ক্ষতি।'

মতী তাঁর কথায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'লোকের কথায় কান দিয়ে আপনারাও নিজেদের ঈমান খারাপ করছেন মশায়? ভাল-মন্দ নিজের কাছে বুঝলেন।'

ইতিমধ্যে বাস এসে গেলে সব কথার ইতি পড়ল, মতী চলে গেল, সতীর ব্যাপারে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েই গেল।
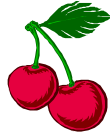
(১৫)

এক-দুই ক'রে যখন ১৯ তারিখ গত হয়ে রাত্রি এসে গেল, তখন হাসীনার মাথার দুর্ভাবনার বোঝা আরো বেশী ভারী হয়ে গেল। ওদিকে দূতী কাজলীর শেষ পুরস্কার লাভের সুযোগটুকুও হাতছাড়া হতে চলল। মন্টু প্রত্যহ টিউশনির নামে হাসীনার বাড়িতে এসে প্রেমের খেলা খেলেই যেত। তাকে প্রায় প্রত্যেকদিন বলেছে, 'চল, আমরা অন্যত্র পালিয়ে গিয়ে নতুন সংসার গড়ি।' কিন্তু হাসীনাই 'শ্যাম রাখি, না কুল রাখি'র দ্বন্দ্বে পড়ে এত দেরী ক'রে ফেলেছে।

মন্টুও ব্যতিব্যস্ত। আজ না গেলে, আগামী কালই তার স্বামী চলে আসবে। আবার হয়তো কোন বাধা এসে পড়বে। সুতরাং সে কাজলীকে সত্বর পাঠিয়ে দিল হাসীনার বাড়ি। কাজলী হাসীনাকে অভয় দিল, খুব বুঝাল, লোভ দেখাল, লাভ দেখাল। অবশেষে রাজি করিয়ে সমস্ত কাজ সেরে শেষ রাত্রে নতুন বেশে একটি ব্যাগ হাতে ক'রে দ্বিতল হতে নেমে এল। কাজলী আহসানকে নিয়ে বেডরুমে শুইয়ে ভাল মতো ঢাকা দিয়ে এল। তারপর দরজায় দরজায় তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল।

বেলা ১১টার দিকে বাস থেকে মতী নামল। গ্রামের সবকিছুই স্বাভাবিক। কেউ কিছুই জানে না। বাড়িতে এসে দেখল সদর দরজায় তালা লাগানো। মনটা যেন কেমন ক'রে উঠল। এ সময় তালা বন্ধ

ক'রে হাসীনা কার বাড়ি বেড়াতে গেল? পাড়াতে কারো সাথে তেমন ভাল মিল নেই তার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কী করবে তাই ভাবতে লাগল। পাড়ার এক কিশোরীর সাথে দেখা হলে তাকে হাসীনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করল। সে 'জানি না' বলে উত্তর দিলে ভাবল, হয়তো কাজলীদের বাড়ি গেছে। ত্রস্তপদে সেদিকে অগ্রসর হল।

কিন্তু কোথায়? কাজলীও তো বাড়িতে নেই। কাজলীর মাতাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, 'সে তো কাল সাঁঝের বেলায় বেরিয়েছে। হাসীনার কাছেই থাকার কথা। বাড়িতে তালাবন্ধ থাকলে হয়তো বাপের বাড়ি গেয়ে থাকবে। কাছে বাপের বাড়ি বলেই তো যখন-তখন চলে যায়।'

কিন্তু তার তো জানা ছিল, সে আজ আসবে। তা সত্ত্বেও সে ওখানে গেল কেন? ঝগড়া-টগড়া তো হওয়ার কথা নয়। মা তো পরই আছে। তাহলে অন্য কোন্ কারণে সে পিত্রালয়ে গেল?

বহু চিন্তা-ভাবনার পর সে আর বাড়ির দিকে না গিয়ে শ্বশুর-বাড়ির দিকে বাস ধরল। সেখানে গিয়ে দেখল, সে নেই। কেউ তার সম্বন্ধে কিছু বলতেও পারল না। উল্টে শ্বশুর-বাড়ির লোকেই নানা প্রশ্ন করতে লাগল, 'সে কোথায় গেছে? তুমি কবে এলে? আবার তোমার মায়ের সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি?' ইত্যাদি।

কোন রকম বুঝিয়ে মতী নিজ বাড়ি ফিরে এল। সঙ্গে ছোট শালাও এল। বাড়িতে তখনও তালা ঝুলছে। গ্রামের কারো বাড়িতে নেই। তাহলে গেল কোথায়? তাদের কোন অথবা কাজলীর কোন আত্মীয়-বাড়ি যায়নি তো। তাও তো কোনদিন যায় না।

কোন এক লোক মারফৎ মাতাকে জিজ্ঞাসা করলে সেও বলেছে,

'আমি কিছু জানি না।'

রাত্রের দিকে সে স্ত্রীর প্রতি চরম আগুন হয়ে উঠল? ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে? গ্রামের কিছু লোকের পরামর্শ ও সহযোগিতায় সদর দরজার তালা ভেঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করল। দেখল, বাড়ির ভিতরেও প্রত্যেক রুমে তালা লাগানো আছে। ডাইনিং রুমে তালা ভাঙ্গল। সেখানে লক্ষ্য করল সিগারেটের অবশিষ্টাংশ পড়ে আছে। পায়ে ক'রে ঠেলে লুকিয়ে দিল, যাতে অন্য লোকে দেখে না ফেলে। এবারে তার অন্য রকম সন্দেহ হতে লাগল। বেডরুমের দিকে তাকিয়ে দেখল, তালা ঝুলছে কিন্তু লাগানো নেই। সেখানে ড্রেসিং টেবিলে দেখল, পাউডারের কৌটা খোলা পড়ে আছে। আলনায় শাড়িগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। কোন কোন শাড়ি নিচে পড়ে আছে। আলমারি খোলা। তাতে ভাল ভাল শাড়িগুলো নেই, গয়নাগুলোর একটাও নেই। এক্ষণে সে আতঙ্কিত হল। তবে কি তার বাড়িতে ডাকাত এসেছিল? তারাই কি তার স্ত্রী-পুত্রকে অপহরণ ক'রে তুলে নিয়ে গেছে?

কিছু পরে পালঙ্কের দিকে নজর পড়লে মনে হল তাতে আপাদমস্তক আবৃত কেউ শায়িত আছে। ধীরে ধীরে সেদিকে অগ্রসর হয়ে আবরণ উন্মোচন করতেই তার শরীর শিউরে উঠল। একি অসম্ভাবনীয় ঘটনা! সেটা বাস্তব বলে তার মন-প্রাণ বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। শিশুপুত্র আহসান নীল হয়ে বিছানায় শায়িত আছে। ছোট শালা তো তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল। কেন? সে ঘুমন্ত না মৃত? মতীর দেহ ঘামতে শুরু করল। একি মর্মান্তিক দৃশ্য! একি দেখছে সে? এ কান্ড কি ডাকাতের?

কিন্তু কাজলী? সেও তো নেই। তাহলে তাকেও কি তারা অপহরণ

ক'রে নিয়ে গেছে?

মতী এ হৃদয়-বিদারক ঘটনাকে সত্য বলে মেনে নিতে পারছিল না। তার সুখের নন্দনকাননে কীভাবে অগ্নিদাহ হল? পুত্র আহসানকে কোলে নিয়ে চুম্বন ক'রে 'বাবা আহসান!' বলে ডুকরে কেঁদে উঠল। কিন্তু সে তখন নিথর পাথরের মতো শীতল হয়ে গেছে। বিষক্রিয়ায় তার শরীর নীলবর্ণ হয়ে গেছে। যদি ঘটনাচক্রে সেদিন সে না আসত, তাহলে সে লাশ হয়তো পচে-গলে দুর্গন্ধময় হয়ে যেত।

কিন্তু এ কাজ কার? কোন্ নিষ্ঠুর পাষাণ এমন নৃশংস কাণ্ড ঘটাল? পিতার হৃদয় দগ্ধে দগ্ধে অনুভব করতে লাগল, সন্তান হারানোর মায়া। যে অনুভব সম্বন্ধে তার মোটেই কোন ধারণা ও অভিজ্ঞতা ছিল না, সেই অনুভব হয়তো তার পিতামাতা করেছে। তারাও সন্তানের জন্য কত দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে!

আহসানকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে মতী পালঙ্কে বসে কাঁদতে থাকল। আহা! সে ব্যথা কি সহ্য করার মতো ব্যথা। প্রাণাধিক স্ত্রী অপহৃতা। প্রাণপ্রিয় সন্তান মৃত। আর বাড়ির অর্থ-অলঙ্কার সব লুণ্ঠিত। তার কি অন্তর্জ্বালার অন্ত থাকে?

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘন হতে চলেছে। উপায়হারা মতী কী করবে, তা স্থির করতে পারছিল না। রহস্য উদ্ঘাটন করার প্রচেষ্টায় সে উঠল। আহসানকে পূর্ববৎ বিছানায় শুইয়ে ঢেকে দিল। শালাকে নিষেধ করল কাউকে কিছু বলতে।

ভাবল রশীদার কাছে যদি কোন খবর থাকে। মা তো বলেছে, 'কিছু জানি না।' কী জানি, সত্যিই জানে না, নাকি বলতে চায় না। তাই জানতে সে নিজেকে সংবরণ ক'রে সলজ্জ মনে রশীদার বাড়ি গেল।

সেখানে তাকে হাসীনা সম্পর্কে প্রশ্ন করার আগে সেই প্রশ্ন ক'রে বসল, 'বাপ মরাতে এলে না কেন? বউ কি এমনই যাদু ক'রে রেখেছে যে, মরার সময়ও বাপকে দেখতে ইচ্ছা হল না।'

মতী কোন উত্তর করল না। রশীদা খেয়াল করল, তার চোখের কোণে অশ্রু ঝলমল করছে। আবার বলল, 'এখন আর আফসোস বা শোক ক'রে কী হবে? সে তো চলেই গেল?'

এবারে মতী বলল, 'ফুফু! আমি আজকে বাড়ি এলাম। দেখলাম তোমাদের বউমা নেই। কোথায় গেছে বা যেতে পারে বলতে পার?

রশীদা বলল, 'কী ক'রে বলব বাবা! সে তো নিজের ইচ্ছায় দিনে অথবা রাতে ঐ ঢেমন মেয়ে কাজলীকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাওয়া-আসা করে। সেখানেই যাবে হয়তো।'

---না সেখানে যায়নি। এই যে ওর ছোট ভাই আমার সাথে আছে।

---তাহলে কাজলীর সাথে কোথাও বেড়াতে গেছে।

---না, আমার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।

তারপরই মতী 'হাউমাউ' ক'রে কেঁদে উঠল। রশীদা চমকে উঠে বলল, 'ডাকাতি?'

---হ্যাঁ গো ডাকাতি! আজকের রাতে। তোমরা কোন আওয়াজ শুনতে পাওনি? আহসানকে বিষ খাইয়ে মেরে কাপড় ঢাকা দিয়ে গেছে। টাকা-গয়না কিছুই নেই। আর হাসীনাকেও তারা তুলে নিয়ে গেছে।

---না, না। ডাকাতি-টাকাতি নয়। আমরা এক পাড়ায় বাস করছি, তোমার মা রয়েছে পাশাপাশি বাড়িতে, কোন কিছু শোনা যায়নি। বউ কি কোন শব্দ না ক'রেই চুপিচুপি তাদের সাথে চলে গেল?

হাসীনার ভাই বলল, 'হয়তো বা প্রাণের ভয়ে চিৎকার করেনি অথবা তারা তার মুখে কাপড় ভরে দিয়েছিল।'

---সতী মেয়ের সতীত্ব থেকে জীবনের দাম বেশী হয় না বাবা! যে মেয়ে ডাকাত-লম্পটদের হাতে পড়েছে, তার আবার বেঁচে থাকার শখ? আর ডাকাতরা কি সঙ্গে বিষ নিয়ে এসেছিল? কোন অস্ত্র দিয়ে না মেরে বিষ দিয়ে মেরে কাপড় ঢাকা দিতে যাবে কেন?

---রশীদার এক ছেলে বলল, 'তাহলে থানাতে ডাইরি কর।'

রশীদা বলল, 'না, এর কারণ অন্য কিছু আছে, চলো তোমার মায়ের কাছে। কিছু না কিছু সে টের পাবেই।'

রশীদা মতীর সাথে এসে বাড়িতে আহসানকে দেখে কেঁদে উঠল। বহু কষ্টে সংবরণ ক'রে মৃত শিশুকে বক্ষে ধারণ ক'রে মায়ের নিকট এল। মা তখন নামায পড়ছিল। নামায শেষ হলে শিশুকে তার সামনে রেখে তাকে জড়িয়ে ধরে মতী কেঁদে উঠল। রশীদা ঘটনা বলতে লাগল। তা শুনে কর্ত্রীও কাঁদতে লাগল। মতী মাকে বলল, 'মা! আমাকে ক্ষমা ক'রে দাও মা!'

মা মতীকে কিছু বলল না। এখন প্রতিশোধ নেওয়ার সময় তার। কিন্তু গর্ভধারিণী মা-ই তো। পারল না এই বিপদের সময় প্রতিশোধের শরাঘাত হানতে। সে রশীদার উদ্দেশ্যে বলল, 'ডাকাতি নয়। অন্য কিছু হবে।'

কী হবে, তার অনুমান ছিল কর্ত্রীর কাছে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। ঘটনা ধীরে ধীরে প্রচার হতে লাগল। কোন কোন লোকের পরামর্শ অনুযায়ী থানায় রিপোর্ট করার কথা পাকা হয়ে গেল। পথিমধ্যে ইমাম সাহেব মতীকে পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সেদিন তো

আমার "নানীর কথা পানি" মনে করলেন। আজ দেখলেন তো? আপনি থানা যাবেন না। ওতে শুধু শুধু হয়রানি ও ঝামেলা বাড়বে। আপনি আহসানের প্রাইভেট মাষ্টারের কাছে খোঁজ নিন।'

তাও তো বটে। সেই তো প্রত্যেক দিন সন্ধ্যায় তার আহসানকে পড়িয়ে যেত। এ কথার জবাবে ইমাম সাহেবকে কিছু না বলে শুধু বলল, 'আপনার কলে একটু পানি খেতে পারি সাহেব!'

'অবশ্যই অবশ্যই' বলে ছুটে গিয়ে একটি গ্লাস এনে দিল। পানি খেয়ে সে মন্টুর বাড়ির দিকে যাত্রা করল। জিজ্ঞাসাবাদের পর জানা গেল যে, সে নাকি কাল থেকে কুটুম-বাড়ি বেড়াতে গেছে। কিন্তু কোথায়, তা কেউ বলতে পারেনি।

এবারে মতীর সন্দেহের গতি পথ পরিবর্তন করল। তাহলে আহসানকে খুন ক'রে তারই সাথে কি হাসীনা-কাজলী পলায়ন করেছে? কিন্তু তাতেও তার বিশ্বাস সুদৃঢ় হল না। কেননা, তার স্ত্রী তাকে ভালবাসতো। সে তার সাথে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।

শালাও বলল, 'না, না। বোন এমন কাজ করতে পারে না।'

কিন্তু মতীর মনে পড়তে লাগল স্ত্রীর গতিবিধি, মন্টুর ব্যাপারে তার অতিশয় আগ্রহ। তাছাড়া কাজলী তার দূতী। আর এ কথাই তো মা বলেছিল, গ্রামের ইমাম সাহেবও বলেছিলেন। ইতিমধ্যে হাসীনার গানের এক কলি তার মনে পড়ে গেল, যে গান সে তার কাছেও মাঝে মাঝে গাইত।

'গোপন প্রেমের মোহন বাঁশি এখন বাজাব,
আমি কোলের ছেলে জলে ফেলে যৌবন সাজাব।'

এক্ষণে তার মনের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে গেল, স্ত্রীর প্রতি যে সুধারণার প্রলেপ ছিল, তা ধীরে ধীরে খসে পড়তে লাগল। ঘৃণা ও রাগে অধীর হয়ে সে শীঘ্রপদে ফিরে এল মায়ের কাছে। পুনরায় মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, 'মা! মা গো! তুমিই আমার মনের ধোঁয়া কাটাতে পার। আমি কিছু বুঝতে পারছি না মা, কেন এমন হল।'

মা সাদা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, 'আমার কীই বা করার ছিল বাবা! ঐ ঢেমন কাজলী আর মন্টুকে অবাধে ঘর ঢুকতে দিয়েই এত বড় সর্বনাশ হয়েছে। আমি মাঝে মাঝে গভীর রাতে বাড়ির ভিতর থেকে সিগারেটের গন্ধ পেতাম।'

রাত্রি যখন গভীর হতে যাচ্ছিল, তখন গ্রামের লোক মিলে মতীর সর্বাঙ্গসুন্দর সন্তান আহসানকে চিরদিনের জন্য সমাহিত ক'রে এল। ফিরে এসে শ্যালককে আর বাড়িতে দেখা যায়নি।

মাতা পূর্বের মতো সন্তানের ভালবাসা ফিরে পেল। যাবার মধ্যে হারিয়ে গেল শ্রদ্ধেয়ভাজন পিতা। তাদের সুখ-বাগিচায় 'বিষে ভরা ফুল' ফুটে সবকিছু উজাড় ক'রে দিয়ে গেল।

কত্রী কত্রী হয়েই ফিরে এল সাবেক বাড়িতে কেঁদে কেঁদে কেঁপে কেঁপে। মতী বলল, 'ভুল বুঝে আব্বাকে হারিয়েছি মা! তোমাকে আর হারাতে চাই না। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করলে মা!'

মা কেঁদে কেঁদেই বলল, 'মা হয়ে ছেলেকে ক্ষমা না ক'রে কি থাকা যায় বাবা ? আল্লাহ তোকে ক্ষমা করুক।'

মতী পরদিন সকাল হতে বসে ছিল না। সে সেই প্রাইভেট টিউটর মন্টু ও কাজলীর খোঁজের নানা উৎস অনুসন্ধান করতে লাগল। সে এখন বুঝেছে, কাজলীই তার চোখের কাজল গালে লাগিয়ে কালি

বানিয়ে দিয়েছে।

থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে তাদের তিনজনের নামে। পুলিশ তাদের খোঁজ করছে। শ্বশুর-বাড়ি লোকেরাও খোঁজ করছে, তবে মতী তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমেও বহু জায়গা খোঁজা হয়েছে। কিন্তু সেই কুলত্যাগিনী পুত্রহন্ত্রী হাসীনা ও দুশ্চরিত্র কাজলীর কথা আজও কেউ বলতে পারেনি।

শুধু একজনের মাধ্যমে জানা গেছে যে, ঐ রাত্রে ভোরের দিকে হাজী পুকুরের পাড়ে কোন গাড়ির আলো তার নজরে পড়েছে। এখন সেই আলোতে যুবক-যুবতীরা যদি সুপথ পায়, তাহলেই ভালো।